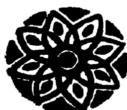
পরিবেশক :
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।



প্রথম প্রকাশ—মার্চ্চ, ১৯৫৪।

প্রকাশক—কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য জগৎ
৩২-জে, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট্
কলিকতা-৬।

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রাকর—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ-ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার
কলিকাতা।

দেড় টাকা

বন্ধু মহম্মদ ইলিয়াস-কে

ভূমিকা

গোড়াতেই ব'লে রাখা ভাল, এটা ভূতের গল্প নয়। কার্ল মার্ক্স-এর 'মজুরী ও পুঁজি' (ওয়েজ লেবার অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল) বইটি অবলম্বন ক'রে অর্থনীতির কথাগুলো সহজ বাংলায় বলবার চেষ্টা করেছি।

কাজটা কঠিন। কিন্তু তাহ'লেও সাহস ক'রে একাজে এখুনি হাত দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে মার্ক্সবাদ-পড়া পণ্ডিতের অভাব নেই। দুঃখের বিষয়, তাঁরা বিদ্যের জাহাজ হ'য়ে ব'সে আছেন—কম লেখাপড়া-জানা মানুষদের কাছে খানিকটা জ্ঞান পৌঁছে দেবার তেমন চাড় তাঁদের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না।

এ বইতে যে খুঁতগুলো আছে, তেমন কেউ লিখলে হয়তো খুঁতগুলো এড়ানো যেত। কিন্তু যতদিন সে ধরনের নিখুঁত বই না হচ্ছে, ততদিন এ ধরনের বইও কাজে লাগবে—এই ভরসায় এ-বই পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে আশা করছি, ছোট ডিঙির আসপর্ধা দেখে জাহাজদের টনক নড়বে।

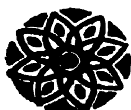
১. ৩. ৫৪ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ভূতের বেগার

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য জগৎ • কলিকাতা

পরিবেশক :
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা।



প্রথম প্রকাশ—মার্চ্চ, ১৯৫৪।

প্রকাশক—কালিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য জগৎ
৩২-জে, সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীট
কলিকতা-৬।

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—
খালেদ চৌধুরী

মুদ্রাকর—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ-ইণ্ডিয়া প্রেস
৭, ওয়েলিংটন স্কোয়ার
কলিকাতা।

দেড় টাকা।

বন্ধু মহম্মদ ইলিয়াস-কে

ভূমিকা

গোড়াতেই ব'লে রাখা ভাল, এটা ভূতের গল্প নয়। কার্ল মার্ক্স-এর 'মজুরী ও পুঁজি' (ওয়েজ লেবার অ্যাণ্ড ক্যাপিটাল) বইটি অবলম্বন ক'রে অর্থনীতির কথাগুলো সহজ বাংলায় বলবার চেষ্টা করেছি।

কাজটা কঠিন। কিন্তু তাহ'লেও সাহস ক'রে একাজে এখুনি হাত দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে মার্ক্সবাদ-পড়া পণ্ডিতের অভাব নেই। দুঃখের বিষয়, তাঁরা বিদ্যের জাহাজ হ'য়ে ব'সে আছেন—কম লেখাপড়া-জানা মানুষদের কাছে খানিকটা জ্ঞান পৌঁছে দেবার তেমন চাড় তাঁদের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না।

এ বইতে যে খুঁতগুলো আছে, তেমন কেউ লিখলে হয়তো খুঁতগুলো এড়ানো যেত। কিন্তু যতদিন সে ধরনের নিখুঁত বই না হচ্ছে, ততদিন এ ধরনের বইও কাজে লাগবে—এই ভরসায় এ-বই পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি। সেই সঙ্গে আশা করছি, ছোট ডিঙির আসপর্ধা দেখে জাহাজদের টনক নড়বে।

১. ৩. ৫৪ — সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গতর নেবে গো, গতর

সন্ধ্যে নাগাদ দেখা গেল কালিঝুলি-মাখা একদল লোক রাস্তা দিয়ে ফিরছে। কারো কারো বয়েস বেশ কম, কিন্তু মাথার চুল একদম শাদা। কাছে যেতেই চোখে পড়ল চুল পাকেনি তাদের। আসলে মাথাভর্তি শাদা শাদা তুলোর আঁশ। লোকগুলো সুতোকলে কাজ করে। কিছু লোক তেল-চপ্‌চপে একদলা পাটের মুড়ি দড়িতে ঝুলিয়ে হন্‌হনিয়ে চলেছে। তারা চটকলে কাজ করে। একজন লোক যাচ্ছে, তার আঙুলের ডগায় কালো কালো সীসের দাগ। লোকটা ছাপাখানায় কাজ করে। দলটার মধ্যে আরও যারা আছে, তারাও মজুর। তবে তাদের দেখে ঠিক আন্দাজ করা যায় না কোথায় কাজ করে।

লোকগুলোর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম "বাপু হে, কত ক'রে মজুরী পাও তোমরা?" কেউ বলল দু টাকা রোজ পায়, কেউ বলল এক টাকা। একেক জন একেক রকম টাকার অঙ্ক বলল। কেউ পায় বাঁধা সময় খেটে, কেউ পায় ফুরনের কাজে।

জিজ্ঞেস করলাম, "মজুরী জিনিসটা কী?" সবাই এবার একসঙ্গে ব'লে উঠল, "আচ্ছা বেকুবের পাল্লায় পড়া গেছে। মজুরী কাকে বলে তাও জানো না? শোনো তাহ'লে। আমরা কেউ কাজ করি ঘণ্টা হিসেবে, কেউ কাজ করি ফুরনে। আমাদের সেই খাটুনি বাবদ মালিক আমাদের হিসেব ক'রে যে টাকাটা দেয়, সেই টাকাটাই হ'ল আমাদের মজুরী।"

হুঁ! তাহ'লে মালিক পয়সাকড়ি দিয়ে মজুরদের খাটুনিটা কিনে নিচ্ছে; আর মজুররাও তেমনি পয়সাকড়ির বদলে মালিককে তাদের খাটুনিটা বেচে দিচ্ছে।

খাটুনি বনাম গতর

শুনে যাই মনে হোক, আসল ব্যাপার কিন্তু মোটেই তা নয়। মজুররা যেটা বেচছে, সেটা মোটেই খাটুনি নয়—আসলে তারা বেচছে তাদের গতর, তাদের খাটবার ক্ষমতা।

তারা খাটুনি বেচছে না কেন? কারণ, খাটুনি বেচা যায় না। হাত গুটিয়ে চুপচাপ ব'সে থাকাকে আমরা খাটুনি বলি না। যখন কেউ কাজে হাত লাগায়, তখনই আমরা বলি সে খাটছে। আর যখনই সে খাটতে শুরু করে, তখনই বুঝতে হবে খাটুনি তার হাতছাড়া হয়ে গেছে। কেননা, খেটেখুটে যা সে তৈরি করছে তার মধ্যে খাটুনিকে সে চালিয়ে দিচ্ছে। খাটুনিটা তাকে ছেড়ে তৈরি-করা জিনিসটার মধ্যে চলে যাচ্ছে। যে কাপড় বুনছে, তার

খাটুনিটা কাপড়ের ভেতরে গিয়ে ঠাঁই নিচ্ছে। যে খাটছে, তার হাতে আর থাকছে না।

তার হাতে যা নেই, তা সে বেচবে কেমন ক'রে? খাটতে শুরু করার পর যা তার হাতে থাকে, তা হ'ল ভবিষ্যতের খাটুনি। সেই ভবিষ্যতের খাটুনি সে বেচতে পারে। সে বলতে পারে, এতটা সময় খাটতে বা এতটা কাজ ক'রে দিতে আমি রাজী আছি। তার মানে, সে তার খাটুনি বেচছে না—সে বেচছে তার গতর, বেচছে তার খাটবার ক্ষমতা। মালিককে গিয়ে সে বলছে—তুমি আমাকে যদি এত টাকা দাও, তাহ'লে এতক্ষণের জন্যে কিম্বা এতটা কাজের জন্যে আমার গতরটাকে ভাড়া নিতে পারো, কাজে লাগাতে পারো। মজুর তার গতর বেচতে পারে, ভাড়া খাটাতে পারে—কেননা গতরটা তার নিজের। গতরটা তার শরীরের মধ্যেই আছে।

কাজেতে যেই হাত দিলে সেই
খাটুনি হাতছাড়া।
দেহের মধ্যে বসত ক'রেই
গতর খাটে ভাড়া॥

মজুরদের এই খাটবার ক্ষমতা মালিক দফায় দফায় কিনে নেয়—কিনে নেয় রোজ, হপ্তা, মাস হিসেবে। তাদের একটা বাঁধা সময় খাটিয়ে তাদের খাটবার সেই ক্ষমতাকে মালিক নিজের কাজে লাগায়।

ধরা যাক, এক মালিক একজন মজুরের কাছ থেকে তার গতর দু টাকায় কিনে নিল। মালিক দু টাকা দিয়ে তাকে বারো ঘণ্টা খাটাবে। মালিক যে টাকা দিয়ে মজুরের গতর

কিনেছে, সেই টাকা দিয়ে ছু সের মাছ কিম্বা অন্য কিছুও কিনতে পারত। ছু সের মাছের দাম ছু টাকা। মালিক ছু টাকা দিয়ে মজুরের গতর কিনে তাকে বারো ঘণ্টা খাটাবে। বারো ঘণ্টা খাটুনির দাম ছু টাকা।

পণ্য দিয়ে পণ্য

সওদা বা পণ্য হ'ল সেই জিনিস যা তৈরি হয় নিজের ভোগের জন্যে নয়, বাজারে বেচার জন্যে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, মাছ যেমন একটা সওদা তেমনি মজুরের গতরটাও একটা সওদা। মাছ ওজন করতে হয় দাঁড়িপাল্লার কাঁটায় আর মজুরের খাটবার ক্ষমতা বা তার গতর মাপতে হয় ঘড়ির কাঁটায়।
মজুর তার গতরটাকে সওদা ক'রে মালিকের হাতে তুলে দিচ্ছে। তার বদলে মালিক তাকে দিচ্ছে টাকা-আনা-পয়সা। কে কতটা দেবে, কে কতটা নেবে তাও তারা আগে থেকে ঠিক ক'রে নেয়। এতক্ষণ গতরটাকে খাটালে এত টাকা দিতে হবে। বারো ঘণ্টা তাঁত চালালে ছু টাকা। ছু টাকায় হরেক রকম জিনিস কিনতে পাওয়া যায়। যা কিছু জিনিস যতটুকু ছু টাকায় পাওয়া যায়, ছু টাকা ব'লতে তাদের প্রত্যেকটিকেই বোঝায়। তাহ'লে তারা নিজেরা আসছে না, তার বদলে তাদের সকলের হয়ে এখানে এসে দূত হিসাবে হাজির হচ্ছে নগদ ছুটো টাকা।
মজুর তখন ছড়া ক'রে বলতে পারে :

গতরটাকে বেচেছি তাই
সওদা গেছে কেনা।
পণ্য দিয়ে পণ্য পেলাম
তাইরে-নারে-না ॥

বদলী-মূল্য, দাম, মজুরী

মজুরের পণ্য তার গতর। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, সেই পণ্যের বদলে সে পাচ্ছে অন্য হরেক রকমের পণ্য। এইসব পণ্য সে পাচ্ছে বাঁধা একটা হিসেবে। দুটো টাকা মারফত মালিক তাকে সারাদিন খাটুনির বদলে দিচ্ছে এইটুকু চাল-ডাল, এইটুকু কাপড়-জামা, এইটুকু কাঠ-কেরোসিন কিম্বা আর কিছু। টাকা দুটো জানিয়ে দিচ্ছে মজুর তার গতর ভাঙিয়ে কোন্ জিনিস কতটা ক'রে পাবে। একটি পণ্যের বদলে অন্য সব পণ্য যে হিসেবে পাওয়া যায়, তাকেই বলে পণ্যের তুল্য-মূল্য বা বদলী-মূল্য বা বিনিময়-মূল্য।

যা দেবো তার সমান নেবো
হুবহু তার তুল্য।
বদল ক'রে যেটুকু পাই
সেটাই বদ্লী-মূল্য ॥

কোন পণ্যের তুল্য-মূল্য বা বদ্লী-মূল্য যখন টাকা-আনা-পয়সায় ধরা হয়, তখন তাকে বলা হয়, সেই পণ্যের দাম। গতর হচ্ছে এমন একটা অদ্ভুত পণ্য যার ঠাঁই হ'ল মানুষের রক্তমাংসের শরীর। এই গতরের দামকেই চল্‌তি-

কথায় বলা হয় খাটুনির দাম। গতরের যে দাম, তারই বিশেষ নাম মজুরী।

তুল্য-মূল্য টাকায় ধ'রলে
পেয়ে যাচ্ছো দাম।
গতর বেচে যে দাম পাচ্ছো
মজুরী তার নাম॥

মজুরীর ভাগ

তাঁত চালায় এমন একজন মজুরের কথা এখানে ধরা যাক। মালিক তাকে তাঁত আর সুতো যোগায়। মজুরটি তারপর সেই তাঁত চালিয়ে সেই সুতো থেকে কাপড়ের থান বোনে। কাপড়ের থানটা যায় মালিকের হাতে; মালিক সেই থানটা বেচে দেয়। ধরা যাক, থানটা বেচে সে বিশ টাকা পেল। যে মজুর খেটেখুটে কাপড়ের থানটা তৈরি করল, তার মজুরী কি ঐ কাপড়ের মধ্যে, বিশ টাকা দামের মধ্যে একটা অংশ হিসেবে থাকে? কখনই তা থাকে না।

কেন থাকে না, সেটা বোঝা দরকার। কাপড়ের থানটা বিক্রি হবার ঢের আগেই মজুরটি তার মজুরী পেয়ে গেছে। তখন হয়তো কাপড়ের থানটা বোনাও শেষ হয়নি। মালিক তার কাপড়ের থান বেচে কাপড়ের সেই দাম থেকে মজুরী দেয় না। তার হাতে যে টাকাটা আগে থেকেই আছে তাই থেকে মজুরী মিটিয়ে দেয়। মালিক যে তাঁত আর সুতো মজুরটিকে যুগিয়েছে, মজুরটি নিজে সেই তাঁত

আর স্থতো তৈরি করেনি; তেমনি আবার মজুরটি তার পণ্যের অর্থাৎ গতরের বদলে অন্য যে সব পণ্য পায়, তার একটাও তার নিজের তৈরি নয়। এমন হ'তে পারত যে, মালিক এমন একজনও খদ্দের পেল না, যাকে সে কাপড়ের থানটা বেচতে পারে। এমনও হ'তে পারত যে, মালিক যে দরে বেচল তাতে মজুরীর খরচটাও পোষাল না। এমনও হ'তে পারে যে, মজুরী দিতে তার যা খরচ পড়েছে, সে তুলনায় যে দামে সে কাপড়ের থানটা বেচল তাতে তার মোটা রকম লাভ থেকে গেল।

কিসে নেই

কাপড় বোনে যে মজুর, সে ওসবের ধার ধারে না। তার দিক থেকে কথা হ'ল 'ফেলো কড়ি, মাখো তেল।' মালিকের হাতে আগে থেকেই যে টাকাটা আছে, যেটা তার পুঁজি—তারই একটা অংশ দিয়ে মজুরের গতরটা মালিক কিনে নিয়েছে; যেমন সে তার হাতের টাকার অন্য অংশটা দিয়ে কিনেছে কাঁচামাল অর্থাৎ স্থতো এবং খাটবার যন্ত্রপাতি অর্থাৎ তাঁত। সব কিছু কেনাকাটা হয়ে যাবার পর (তার মধ্যে মজুরের গতরটাও পড়ে, কেননা তা না হ'লে কাপড় তৈরিই হ'তে পারে না) মালিক শুধুমাত্র তার কাঁচামাল আর খাটবার যন্ত্রপাতিগুলো দিয়ে কাপড় উৎপাদন করে। এবার অবশ্য খাটবার যন্ত্রপাতিগুলোর কোঠায় মজুর বেচারীও প'ড়ে যাচ্ছে। কেননা, মজুর নইলে যন্ত্রপাতি অচল হয়ে

থাকে। এত সব ক'রে তবে যে কাপড় তৈরি হ'ল, তাতে যেমন তাঁত-যন্ত্রটার কোন বখরা থাকে না, তেমনি মজুরটিরও কোন বখরা থাকে না।

কিসে আছে

মজুর যে পণ্য তৈরি করে, তাতে তার কোন ভাগ থাকে না; কাজেই তার মজুরীও সেই পণ্যের মধ্যে থাকে না। মালিক নিজের কাজে লাগাবে ব'লে মজুরের গতরের খানিকটা কিনে নেয়, তার বদলে মজুরকে দেয় এমন সব পণ্য, যা আগে থেকেই আছে। যেমন চাল-ডাল, কাপড়-জামা, কাঠ-কেরোসিন ইত্যাদি। কাজেই মজুরী হ'ল এইসব আগে থেকে তৈরী জিনিসের (চাল-ডাল, কাপড়-জামা, কাঠ-কেরোসিন ইত্যাদির) একটা অংশ।

নতুনে ভাগ পায় না মজুর
মজুরী তবে কিসে ?
যা পুরনো, তার মধ্যে
মজুরী আছে মিশে।

মজুরের বেচবার জিনিস তার গতর। যার হাতে পুঁজি আছে, মজুর তাকে গতর বেচে দিয়ে পায় মজুরী। কেন সে তার গতর বেচে ? বাঁচবার জন্যে।

মজুরের খাটুনি, এই গতর খাটানোটাই হ'ল তার জীবনের স্বধর্ম। এইভাবে তার জীবনকে সে ফুটিয়ে তোলে। তার জীবনের স্বধর্মকে সে অন্যের কাছে বিকিয়ে দেয়—যাতে বেঁচেবর্তে থাকার জন্যে যেটুকু নইলে 'নয়, তা সে পেতে পারে। এইভাবে জীবনের স্বধর্মটা তার কাছে হয়ে দাঁড়ায় কোনমতে নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার উপায় মাত্র। সে কাজ করে কোনমতে জানেপ্রাণে বেঁচে থাকার জন্যে। খাটুনি যে জীবনেরই একটা অঙ্গ—তা সে মনেও করে না। বরং মনে করে, খেটে খেটে জীবনটাকেই সে বরবাদ ক'রে দিচ্ছে। নিজের খাটুনিকে পণ্য ক'রে সে পরের হাতে তুলে দিয়েছে। যে জিনিসটা সে গতর খাটিয়ে তৈরি করছে, সেটা তার হবে না। তার খাটুনির ফল সে নিজে ভোগ করতে পারবে না। যেটা সে তৈরি করে, সেটা তার ভাবনার মধ্যে নেই। সে ভাবে অন্য কথা। সে খাটে যাতে বাঁচবার যোগাড় করতে পারে—কিছুটা চাল-ডাল, কিছুটা কাপড়-জামা, কিছুটা কাঠ-কেরোসিন ইত্যাদি পেতে পারে।

সারাদিন সে রেশমের থান বুনছে, খাদ কেটে সোনা তুলছে, ইঁটের পর ইঁট গেঁথে মস্ত মস্ত ইমারত গড়ছে—কিন্তু তার একটাও সে তার নিজের জন্যে করছে না। নিজের জন্যে যেটুকু সে উপায় করছে, সেটা তার মজুরী। আর সেই রেশমের থান, সোনাদানা, বড় বড় ইমারত মিলিয়ে

গিয়ে তার কাছে ধরা দিচ্ছে কোন রকমে দিন গুজরানোর এতটুকু উপায় হিসেবে। রেশমের থান বুনে, খনি থেকে সোনা তুলে, বড় বড় প্রাসাদ বানিয়ে সে নিজে হয়তো পাচ্ছে একটা জ্যাল্‌জেলে সুতোর ফতুয়া, গোটা কয়েক তামার পয়সা, মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই।

কলের মানুষ

যে মজুর বারো ঘণ্টা ধ'রে তাঁত চালায়, সুতো কাটে, লোহা বিঁধ করে, দালান গাঁথে, বেল্‌চা ঠেলে, পাথর ভাঙে, মোট বয়—বারো ঘণ্টা ধ'রে এই হাড়ভাঙা খাটুনিকে সে কি জীবন ব'লে মনে করতে পারে? সে কি ভাবতে পারে, বারো ঘণ্টা মুখে রক্ত তুলে খেটে জীবনকে সে ফুটিয়ে তুলছে? কখনই তা সে ভাবতে পারে না। সে বরং উল্টো কথা ভাবে। যখন তার কাজ শেষ হয়, যখন সে গরম একথালা ভাত নিয়ে বসে, নেশা ক'রে বুঁদ হয়, মাদুরে গা এলিয়ে দেয়—তখনই সে ভাবে, এতক্ষণে বাঁচলাম। বারো ঘণ্টা ধ'রে এই যে সে তাঁত চালায়, সুতো কাটে, লোহা বিঁধ্ করে—একমাত্র রোজগার ছাড়া এসব কাজের আর কোন মানেই তার কাছে নেই। নিছক রোজগারের জন্যেই সে খাটে। সে জানে রোজগার করতে পারলে তবেই কপালে একথালা গরম ভাত জুটবে, তবেই সে নেশা ক'রে বুঁদ হ'তে পারবে, তবেই সে মাদুর বিছিয়ে শুতে পারবে। মজুর কলেই শুধু কাজ করে না। সে প্রাণহীন

কলের মতই খেটে যায়—অবিকল। দম-দেওয়া কলের পুতুলের মত। রেশমের কীটকে যদি গুঁটিপোকা হ'য়ে টিঁকে থাকার জন্মে সুতো বার করতে হ'ত, তাহ'লে সে হ'তে পারত একটা নিখুঁত ভাড়াখাটা মজুর।

কেনা গোলাম

গতর বেচবার রেওয়াজটা খুব বেশীদিনের নয়। এমন সময় ছিল যখন খাটুনির বদলে মজুরী দেবার কোন কথাই উঠতে পারত না। একটা যুগে মানুষ কেনাবেচা হ'ত। ধরা যাক, সেই সময় একজনকে পয়সা দিয়ে কিনে এনে ক্রীতদাস ক'রে রাখা হয়েছে। কোনদিন সে যদি তার মনিবকে গিয়ে বলত, "তুমি যদি আমাকে এতক্ষণ খাটাও তো এত টাকা দিতে হবে।" তাহ'লে মনিব তাকে আর আস্ত রাখত না। হাতে মাথা কাটত। নগদ টাকায় সে ঐ গোলামটাকে কিনেছে। লোকটাকে সে জীবনভর যতক্ষণ খুশি খাটাবে। একবারে টাকা দিয়েই তো সে কিনেছে, আবার কোন্ দুঃখে টাকা দিতে যাবে? হালের বলদটা যে সারাদিন খাটে, কই সে তো টাকার কথা মুখেও আনে না?

সত্যিই ক্রীতদাসের হালটা ছিল ঐ হালের বলদের মতই। মনিবের কাছে চিরজীবন সে বাঁধা থাকত। সে ছিল বেচা-কেনার জিনিস। মনিবের কেনা-গোলাম। তার মনিব তাকে যে-কারো কাছে যখন খুশি বেচে দিতে পারত।

তার বাঁচা-মরা ছিল মনিবের হাতে। মনিব তাকে যমের বাড়ী পাঠালেও তার বলার কিছু থাকত না। বাজারের আর পাঁচটা পণ্যের মতই সেও এর হাত থেকে ওর হাতে যেত। সে নিজেই যখন আস্ত একটা পণ্য, তখন তার পক্ষে তার গতরটাকে আলাদা ক'রে পণ্য হিসেবে বেচবার কোন কথাই উঠত না। .

মাটির ডাণ্ডাবেড়ি

এর পরের যুগে দেখা দিল ভূমিদাসের দল। তারা আধখানা স্বাধীন, আধখানা পরাধীন। মনিবরা তাদের ইচ্ছে করলেই গলা কেটে খুন করতে পারত না। কিন্তু গলা কাটত অন্যভাবে। ভূমিদাসদের নিজেদের খুশিমত কিছু করার বা কোথাও যাবার স্বাধীনতা ছিল না। তারা বাঁধা থাকত জমির সঙ্গে। জমির মালিকই তাদের মালিক। জমি যখন যে মালিকের হাতে যেত, তারাও সঙ্গে সঙ্গে সেই মালিকদের হয়ে যেত। জমি থেকে লোকগুলোর নড়বারও হুকুম ছিল না। হপ্তায় কয়েকটা দিন জমিদারের খাসখামারে গিয়ে তাদের বেগার খাটতে হত। গতরের খানিকটা তারা পরের হাতে তুলে দিত। কিন্তু তার জন্যে তারা জমিদারের কাছ থেকে কোনই মজুরী পেত না। খাটুনির দরুন তারা তো কিছু পেতই না, বরং উল্টে তাদেরই দিতে হত। জমির সমস্ত ফসলটাই জমিদারের গোলায় তুলে দিয়ে আসতে হ'ত। নিজেকে টিঁকিয়ে রাখার জন্যে পেত

শুধু একটুখানি চাকরান জমি। যন্ত্রপাতিটা তার হ'লেও জমিটা তার নয়। কিন্তু জমিটার সঙ্গে তার হাতপা বাঁধা। হাত বদল হয়ে জমি যে পেত, সে ভূমিদাসকেও ভূমির সঙ্গে সঙ্গে ফাউ হিসেবে পেয়ে যেত। তাদের পায়ে পরানো থাকতো যেন মাটির ডাণ্ডাবেড়ি।

কিছু নেই, তাই স্বাধীন

যারা ছিল ভূমিদাস কিম্বা চাষী-প্রজা, পরে জমি হারিয়ে তারাই হ'ল সব-হারা মজুর! জমিদারদের অত্যাচারে দলে দলে লোকে জমিজমা ফেলে বনজঙ্গলে কিম্বা শহরে পালিয়ে গেল। অনেক জায়গায় জমিদাররা চাষীদের উচ্ছেদ ক'রে চাষের জমিতে পশু চরাতে লাগল। জমি হারিয়ে চাষীরা বাধ্য হয়ে মজুরী খাটতে লাগল। যারা মজুরী নিয়ে খাটে, ক্রীতদাস কিম্বা ভূমিদাসদের তুলনায় তারা খাটুনির দিক থেকে স্বাধীন। আজকের মজুররাও নিজেদের বেচে; কিন্তু সবটা একবারে আস্ত বেচে না—দফায় দফায় ভাগ ভাগ ক'রে নিজেদের তারা বেচে। প্রত্যেকটা দিন মজুর তার জীবনের আট, দশ, বারো, পনেরোটি ঘণ্টা নিলামে চড়ায়—যে সব চেয়ে বেশী দর হাঁকে, তার কাছেই সে বেচে। কাঁচামাল, খাটবার যন্ত্র আর জীবন-ধারণের উপায়ের যে মালিক—অর্থাৎ যার হাতে পুঁজি আছে, তার কাছেই সে জীবনের একেকটা দিন ঘণ্টার হিসেবে ভেঙে ভেঙে বেচে। মজুর কারো কেনা

গোলাম নয়, জমির সঙ্গেও সে বাঁধা নয়। কিন্তু তার রোজকার জীবনের আট, দশ, বারো, পনেরোটি ঘণ্টা বাঁধা পড়ে যায়। যে তার সেই ঘণ্টাগুলো কিনে নেয়, বাঁধা পড়ে তার কাছে। যে মালিকের কাছে মজুর নিজেকে ভাড়া খাটায়, তাকে সে যখন খুশি ছেড়ে যেতে পারে। মালিকও যখন দেখে তাকে খাটিয়ে তার কোন ফয়দা হচ্ছে না কিম্বা যতটা লাভ করবে ব'লে ভেবেছিল ততটা করতে পারছে না—তখন দরকার হ'লেই তাকে ছাড়িয়ে দিতে পারে।

সব হারিয়ে গতরগুলো
নাচছে তাধিন্ তাধিন্।
জমি নেইকো, নেই হাতিয়ার
অর্থাৎ, আমরা 'স্বাধীন'॥

হয় এ-দুয়োর, নয় ও-দুয়োর

মজুরের সামনে রুজিরোজগারের একটিমাত্র রাস্তাই খোলা থাকে। সে রাস্তা হ'ল গতরটাকে বিকিয়ে দেবার রাস্তা। যাদের হাতে পুঁজি আছে, শুধু তারাই কিনবে।

কারখানার দুয়োরে দুয়োরে গিয়ে মজুর হাঁক দেয়—"গতর নেবে গো, গতর?" এমনিভাবে মজুর তার গতর ফেরি ক'রে বেড়ায়। যে কোন মালিককে ছেড়ে যাবার স্বাধীনতা তার আছে। কিন্তু কোন না কোন মালিকের কাছে তাকে যেতেই হবে। কেননা, তার বেচবার জিনিসটা এমন যে,

ইচ্ছে করলেই যে কেউ তা কিনতে পারে না। যার হাতে পুঁজি আছে, সেই শুধু কিনতে পারে। শুধু মালিকরাই তার গতর কিনতে পারে।

যদি কোন মজুর জেদ ধ'রে বলে, "উঁহু, কোন মালিকের দুয়োরেই আর আমি যাচ্ছিনে।" তাহ'লে তাকে রুজির অভাবে না খেয়ে থাকতে হবে। তখন হয় তাকে মাথা নুইয়ে কোন না কোন মালিকের দুয়োরে যেতেই হবে, নয়তো যমের দক্ষিণ দুয়োর দেখতে হবে।

গতরের গতি করা

বাঁচতে গেলে মজুরের সামনে শুধু একটা রাস্তাই খোলা। নিজের গতরটাকে বিকিয়ে দেবার রাস্তা। এই রাস্তা দিয়ে ঘুরে ফিরে তাকে মালিকদের কাছেই যেতে হয়। কোন একজন মালিকের কাছে সে বাঁধা নয়—গোটা মালিক শ্রেণীটার কাছেই সে বাঁধা। তার তো কাজই হ'ল নিজের একটা হিল্লে করা—অর্থাৎ, যাদের হাতে পুঁজি আছে, তাদের ভেতর থেকেই একজন খদ্দের খুঁজে নেওয়া।

মজুরী আর পুঁজির সম্পর্কটা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে এক নজর দেখে নেওয়া যাক মজুরী ঠিক করতে গিয়ে মোটামুটিভাবে কোন্ কোন্ সম্পর্ক বিচার করা হয়ে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, মজুরী হল একটা বিশেষ পণ্যের দাম। সে পণ্য হ'ল মানুষের কাজ করবার সামর্থ্য, মানুষের গতর। মজুরীর হার কিভাবে ঠিক হয়? যেভাবে পৃথিবীর আর

পাঁচটা পণ্যের দাম ঠিক হয়, সেইভাবেই মজুরীর হারও ঠিক হয়ে থাকে।

তা'হলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে : পণ্যের দাম কিভাবে যাচাই হয় ?

কানামাছি ভোঁ-ভোঁ

কোন একটা পণ্যের দর কিভাবে যাচাই হয় ?

যারা বেচে এবং যারা কেনে তারা পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে পাল্লা দিচ্ছে, চাহিদার তুলনায় যোগান কত—এইসব দেখে-শুনে পণ্যের দর ঠিক হয়। যে টক্কর দেওয়ার ভেতর দিয়ে জিনিসের দর ঠিক হয়, তার তিনটে দিক আছে।

বাজারে হয়তো একই রকমের জিনিস পাঁচ জন পাঁচ হাতে বেচছে। জিনিস হিসেবে কোনটাই হয়তো কোনটার চেয়ে সরেস কিম্বা নিরেস নয়। যে সেই জিনিস সবচেয়ে শস্তায় বাজারে ছাড়বে, তার মালটাই বাজারে সবচেয়ে বেশী কাটবে। তার কাছে অন্যেরা দাঁড়াতেই পারবে না। বাজার থেকে তাদের হটে যেতে হবে।

হাটের মধ্যে হাঁকাহাঁকি

প্রথমত : যারা বেচতে চায় বেচবার জন্যে, বাজার পাবার জন্যে তাদের নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। প্রত্যেকেই বেচতে চায়, প্রত্যেকেই চায় যতটা সম্ভব তার মাল কাটিয়ে দিতে; আর সম্ভব হ'লে সে একাই বেচবে, বেচবার লোক আর কেউ তার ধারেকাছে থাকবে না। তারই জন্যে একজন আরেকজনের চেয়ে শস্তায় বাজারে মাল ছাড়ে। ফল যা হবার তাই হয়। যারা

বেচে তারা এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে থাকে ; তাতে বাজারে তাদের জিনিসের দর প'ড়ে যায়।

দ্বিতীয়ত: যারা কেনে, তারাও আবার এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে থাকে। প্রত্যেকে চায় আর সবাইকে হটিয়ে দিয়ে নিজে যতটা পারে কিনে নিতে। ফল যা হবার তাই হয়। যে জিনিস তারা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিনতে চায়, সেই জিনিসের দাম যায় চ'ড়ে।

সবশেষে দেখা যায়: যে দলটা বেচছে আর যে দলটা কিনছে—তারা এ-দল ও-দলের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে। প্রথম দলটা চায় যতটা পারে চড়া দামে জিনিস বেচতে। আর দ্বিতীয় দলটা চায় যতটা শস্তায় পারে সেই জিনিস কিনতে। তারপর লাগ-লাগ ক'রে দু'দলে লেগে যায় যেন যুদ্ধ।

কে জেতে, কে হারে

শেষ পর্যন্ত দু দলের মধ্যে কোন্ দল হারবে আর কোন্ দল জিতবে? যাদের নিজেদের দলের মধ্যে রেষারেষি সবচেয়ে কম তারাই জিতবে। আগেই আমরা দেখেছি—যারা বেচছে, তারা এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেচতে চাইছে; আর যারা কিনছে, তারাও এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিনতে চাইছে।

যারা বেচতে চায় আর যারা কিনতে চায় তারা যেন তারপর দুটো সৈন্যদলে ভাগ হয়ে গেল। দুটো দলেরই সেপাইরা

আবার যে যার দলে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করছে। যে দলের মধ্যে সেপাইদের নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি সবচেয়ে কম, সেই দলই অন্য দলকে যুদ্ধে হারাতে পারবে।

বেচনদার আর যাচনদার

মনে করা যাক, বাজারে একশো গাঁট কাপড় আছে। আর সেই সঙ্গে খদ্দের আছে হাজার গাঁট কাপড়ের। মাল আছে একশো গাঁট, কিন্তু চাহিদা আছে হাজার গাঁট মালের। খদ্দেররা প্রত্যেকেই চাইছে অন্যদের হটিয়ে দিয়ে নিজে সেই মাল শুধু দু'এক গাঁট কেন, পারলে সবটাই কিনে নিতে। তার জন্যে প্রত্যেকেই অন্যদের চেয়ে একটু বেশী দর দিতে চাইছে। কাপড়ের ব্যাপারীরা তখন বুঝতে পারল খদ্দেরদের মধ্যে জোর খেয়োখেয়ি চলেছে এবং এও ঠিক যে গুদামে তাদের এক গাঁট মালও প'ড়ে থাকবে না। ব্যাপারীর দল তখন ঠিক করে নেয়—খদ্দেররা যখন এ-ওকে টেক্কা দিয়ে জিনিসের দর চড়িয়ে দিচ্ছে, তখন তারা এ সময় একজন আরেকজনের চেয়ে কম দরে জিনিস বেচে নিজেদের ঘর ভাঙাভাঙি করবে না। তার ফলে, হঠাৎ দেখা যায় ব্যাপারীদের মধ্যে দারুণ ভাই-ভাই ভাব। তারা সবাই এক হয়ে খদ্দেরদের মহড়া নিচ্ছে। খদ্দেরদের মধ্যে যাদের খাঁই সবচেয়ে বেশী, তাদেরও দর দিতে পারার একটা ক্ষমতা থাকে। তার বেশী তারা উঠতে পারে না। তা

যদি তারা পারত, তাহ'লে ব্যাপারীর দল যে তাদের কাছে আকাশের চাঁদ চেয়ে ব'সত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যাপারীরা বুঝেছে যেই
খরিদ্দারের খাঁই।
হাত গুটিয়ে কুরুপাণ্ডব
হচ্ছে এ-ওর ভাই।

পাল্লা দেওয়ার মাত্রা

মালের চাহিদার চেয়ে মালের যোগান যদি কম হয়, তাহ'লে আর ব্যাপারীরা এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেচে না—যদি কখনও পাল্লা দেয়ও, তার পরিমাণ খুবই সামান্য হয়। ব্যাপারীদের নিজেদের মধ্যে পাল্লা দেওয়ার মাত্রা যত কমে, খদ্দেরদের মধ্যে পাল্লা দেওয়ার মাত্রা ততই বাড়ে। ফলে, জিনিসের দর কমবেশী চ'ড়ে যায়।

এর উল্টো ব্যাপারও আবার ঘটে থাকে। হামেশাই দেখা যায়, বাজারে যা চাহিদা, তার চেয়ে বাজারে মালের যোগান অনেক বেশী। ব্যাপারীরা তাদের মাল কাটানোর জন্যে এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শস্তায় বাজারে মাল ছাড়ে, ফলে অনেক সময় জলের দরে জিনিস বিকিয়ে যায়।

কিন্তু জিনিসের দর চড়ে যাওয়া, দর পড়ে যাওয়া, চড়া দর, শস্তা দর—এ সবের মানে কী? অণুবীক্ষণ-যন্ত্রে দেখলে বালির একটা কণাকে তো বেশ ঢ্যাঙা ব'লেই মনে হয়। আবার একটা পাহাড়ের পাশে একটা তালগাছকে দেখলে তাকে ঐ পাহাড়টার নখের যুগ্যি ব'লেও মনে হয় না।

কোন কিছুর পাশে যখন
ধরছি অন্য কিছু
একই জিনিস হয়ে যাচ্ছে
উঁচু কিম্বা নীচু

মালের চাহিদা আর মালের যোগান দিয়ে সেই মালের দর ঠিক হয়—এটা তো বোঝা গেল। কিন্তু চাহিদা আর যোগানের সম্পর্কটা কী দিয়ে ঠিক হয়?

লাভের গাঁতি

গোলমেলে প্রশ্নটার উত্তরের জন্যে সোজাসুজি একজন মালিককে গিয়ে ধরা যাক। রাজা বিক্রমাদিত্য যেমন বেতালদের হেঁয়ালির চটপট জবাব দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি-ভাবে সেই মালিকও প্রশ্নটা শোনামাত্র সঙ্গে সঙ্গে টক্‌টক্‌ ক'রে অঙ্কের হিসেবে জবাব দেবে। সে বলবে, "দেখ বাপু, যে জিনিসটা তৈরি করতে আমার ১০০৲ টাকা খরচ হয়েছে, এক বছরের মধ্যে সেটা বেচে যদি আমি ১১০৲ টাকা পাই—তা'হলে বুঝব আমার রীতিমত লাভ হয়েছে। কিন্তু যদি সেটা বেচে আমি ১২০৲ টাকা কিম্বা ১৩০৲ টাকা পাই, তা'হলে বুঝব ঢের লাভ করেছি। আর যদি আমি সেই জিনিস ২০০৲ টাকায় বেচতে পারি, তাহ'লে বুঝব দেদার লাভ করা গেছে।"

মালিক তা'হলে কিভাবে তার লাভ যাচাই করে? মাল তৈরি করতে তার কত পড়তা পড়েছে, তাই দেখে। সে যদি তার

ঐ মালের বদলে কিছুটা ক'রে এমন সব মাল পায়, যা তৈরি করতে কম পড়তা পড়েছে—তাহ'লে সে বুঝবে তার লোকসান হ'ল। আর তার মালের বদলে সে যদি কিছুটা ক'রে এমন সব মাল পায়, যা তৈরি করতে বেশী পড়তা পড়েছে—তাহ'লে সে বুঝবে তার লাভ হ'ল। মাল তৈরি করতে যা পড়তা পড়েছে, তার চেয়ে মালের বদ্‌লী-মূল্য (অর্থাৎ, মালের দাম) যত বেশী হবে ততটা হবে লাভ, যত কম হবে ততটা হবে লোকসান।

লাভ-লোকসান কোন্ নিরিখে
যাচাই করেন, কর্তা ?
হিসেব ক'রে নিচ্ছি দেখে
প'ড়ল কত পড়তা ॥

বাড়লে কমে, কমলে বাড়ে

মালের যোগান এবং মালের চাহিদা কম-বেশী হওয়ার দরুন কিভাবে মালের দর কখনও বাড়ে, কখনও কমে—তা আমরা আগেই দেখেছি। বাজারে মাল কম থাকার জন্যে কিম্বা চাহিদা বেজায় বেড়ে গেছে ব'লে যদি কোন মালের দাম হুহু ক'রে বেড়ে যায়, তাহ'লে বুঝতে হবে অন্য কোন মালের দামও সেইমত হুহু ক'রে কমে গেছে। কেননা জিনিসের দাম ব'লতে আমরা বুঝি—সেই জিনিসটার বদলে অন্য জিনিস আমরা কতটা ক'রে পাবো। ধরা যাক, আমার কাছে দু সের দুধ আছে। দু সের দুধ বেচে আমি

দাম পাবো হু টাকা। হু টাকা দিয়ে আমি চার সের চাল কিনতে পারি। হঠাৎ চালের দর বেজায় চ'ড়ে গেল। এক সের চালের দাম হ'ল এক টাকা। তখন আর আমি হু সের হুধের বদলে চাল চার সের পাচ্ছি না, পাচ্ছি মোটে হু সের। চার সের চাল পেতে গেলে তখন আমাকে চার সের হুধ দিতে হবে। চালের দাম হু গুণ চ'ড়ে যেতেই চালের দামের তুলনায় হুধের দামও সেইমত অর্ধেক হয়ে গেল। কেউ হয়তো হুধ বেচে না, তেল বেচে। তারও আমার মত দশা হবে। চালের দর হু গুণ চড়লে, চালের তুলনায় তেলের দামও অর্ধেক হয়ে যাবে। চালের দাম যতটা বাড়বে, সে তুলনায় অন্য সব জিনিসের দামই ততটা ক'রে কমবে।

পুঁজির ঝোঁক

দেখা গেল বাজারে কোন একটা জিনিসের দাম কেবলি বাড়ছে। যাদের হাতে পুঁজি আছে, তারা তখন দলে দলে সেই জিনিসের কারবারে টাকা খাটাবার জন্যে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়বে। কিছুদিন পর যখন দেখা যাবে সেই কারবারে লাভের মাত্রা ক'মে মামুলি লাভে এসে ঠেকেছে, কিম্বা দেদার উৎপাদন হওয়ায় জিনিসটার দর এত প'ড়ে গেছে যে পড়তাতেও পোষাচ্ছে না—তখন আর নতুন পুঁজি সেদিকে ঘেঁষবে না।
হয়তো কোন একটা সময় দেখা গেল ছাপাখানার মালিকরা ছাপার কারবারে হুহাতে পয়সা পিটছে। তখন অন্য যাদের হাতে খাটাবার মত পুঁজি আছে, তারা দলে দলে

ছাপাখানা খুলতে লাগল। কিছুদিন পর যখন দেখা গেল বাজারে যা ছাপার কাজ রয়েছে, তার তুলনায় ছাপাখানা বেশী হয়ে গেছে—তখন ছাপার কাজ পাবার জন্যে ছাপাখানার মালিকরা এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দর কমাতে লাগল। ফলে, ছাপার কারবার ক'রে দুদিনে লাল হওয়ার আর উপায় থাকল.না। মামুলি লাভ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হল। অবস্থা আবার এমনও হ'তে পারে যে, অলিতে গলিতে ব্যাঙের ছাতার মত ছাপাখানা গজিয়ে ওঠায় ছাপার কাজের দর এত প'ড়ে গেল যে লাভ করা দূরে থাক—তাতে ছাপাখানা চালানোর খরচাও আর ওঠে না।

দে-ছুট দে-ছুট

এদিকে আবার জিনিস বেচে যদি জিনিসটা তৈরি করার খরচাটুকুও না উঠে আসে তাহ'লে সে কারবারে লোকে খামাখা টাকা খাটাতে চাইবে কেন? কাজেই সেই কারবারে যারা পুঁজি ঢেলেছিল, তারা তাদের পুঁজি উঠিয়ে নিয়ে একে একে কেটে পড়বে। ফলে তখন সেই জিনিসটার উৎপাদন কমে আসবে। জিনিসটার যোগান কমতে কমতে এমন একটা অবস্থায় আসবে, যখন সেই জিনিসের চাহিদার সঙ্গে তা খাপ খেয়ে যাবে। তখন সেই জিনিসটার দাম, সেটা তৈরি করতে যা পড়তা পড়েছে অর্থাৎ, তার উৎপাদনের খরচের সমান সমান হবে। কিন্তু যে কোন জিনিসের বাজার-দর সব সময়েই তার উৎপাদনের খরচের চেয়ে কম কিম্বা বেশী হয়। সুতরাং

জিনিসটার উৎপাদন এত কমে যাবে যে, তার যোগান তার চাহিদার চেয়ে কম হবে—তখন তার দামও উৎপাদনের খরচের তুলনায় বেড়ে যাবে। কোন শিল্প যদি এমন হয় যা একদম অকেজো হয়ে গেছে, তাহ'লে অবশ্য তার পক্ষে আবার এভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠা সম্ভব নয়—ধ'রেই নিতে হবে তার দিন ফুরিয়ে গেছে। কৃত্রিম উপায়ে নীল রং তৈরি হবার পর থেকে যেমন দুনিয়া থেকে নীলের চাষ একদম উঠেই গেল।

কম-বেশীর কাটাকাটি

এক কারবার থেকে পুঁজি গুটিয়ে নিয়ে অন্য কারবারে ফেলা —এতো আমরা হামেশাই ঘটতে দেখি। চড়া দর দেখে একধার থেকে লোকে পুঁজি লাগায়, দর কমতে দেখে তেমনি একধার থেকে লোকে পুঁজি উঠিয়ে নেয়। ছড়া কেটে ব'ললে ব্যাপারটা এই রকমের দাঁড়ায় :

দর যেই চড়ে
পুঁজি গিয়ে ভেড়ে।
দর যেই পড়ে
পুঁজি যায় ছেড়ে॥

চাহিদা আর যোগান একটা অন্যটার চেয়ে কম কিম্বা বেশী হওয়ার দরুন পণ্যের দর ক্রমাগত তার উৎপাদনের খরচের কোঠায় ফিরে ফিরে আসে। এটা ঠিক যে, কোন একটা জিনিসের সত্যিকার দর সব সময়েই তার উৎপাদনের খরচের

চেয়ে কম কিম্বা বেশী হয়; কিন্তু আখেরে গিয়ে এই কম আর বেশীর মধ্যে কাটাকাটি হয়ে যায়। একটা টানা সময় যদি ধরা হয়, তাহ'লে সেই গোটা সময়ের মধ্যে শিল্পজগতের জোয়ার-ভাঁটা মেলালে দেখা যাবে: পণ্যের সঙ্গে পণ্যের লেনদেন হচ্ছে, কোন্‌টা তৈরি করতে কি রকম পড়তা পড়েছে সেই বুঝে। তা যদি হয়, তাহ'লে তাদের দরও যাচাই হচ্ছে উৎপাদনের খরচ দিয়ে।

ঘটন-অঘটন

উৎপাদনের খরচ দিয়ে পণ্যের দর যাচাই হয়—একথা অর্থনীতির দিগ্‌গজ পণ্ডিতরাও ব'লে থাকেন। তবে তাঁরা বলেন অন্য রকম অর্থে। তাঁরা বোঝাতে চান, সমস্ত পণ্যের গড়পড়তা দর উৎপাদনের খরচের সমান। তাঁরা বলেন, এটাই নাকি নিয়ম। যে এলোপাথাড়ি ঘুরপাকের ভেতর দিয়ে ওঠা আর পড়া, পড়া আর ওঠা একটা আরেকটাকে সামাল দেয়—সেই এলোপাথাড়ি ঘুরপাকটা তাঁদের মতে হঠাৎ ঘটে থাকে। এর উত্তরে যদি কেউ সমান জোর দিয়ে বলে, "তোমাদের কথাটা মিথ্যে; যেটাকে তোমরা বলছ হঠাৎ ঘটছে, সেটাই নিয়ম। আর যেটাকে তোমরা ব'লছ নিয়ম, সেটাই হঠাৎ ঘটছে। ওঠা-পড়াটাই নিয়ম; উৎপাদনের খরচ দিয়ে দর যাচাই করার ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটছে।" তাহ'লে বুঝতে হবে সে ঠিক কথাই বলছে। অর্থনীতির কোন কোন পণ্ডিতও সে কথা বলতে ভয় পান নি।

তালে গোলে ঘোরা

এই টালমাটাল অবস্থাটাকে যদি একটু খুঁটিয়ে দেখা যায়, তাহ'লে দেখতে পাওয়া যাবে কিভাবে তা মানুষের জীবনে পায়ে পায়ে ধ্বংসের বান ডেকে আনছে, কিভাবে তা প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মত ধনতান্ত্রিক সমাজের ভিৎসুদ্ধ নাড়িয়ে দিচ্ছে। নিছক এই টালমাটাল অবস্থাতেই উৎপাদনের খরচের ভেতর দিয়ে পণ্যের দর যাচাই হচ্ছে। পুরো পাকে ঘোরাই হ'ল এই খামখেয়ালিপনার নিয়ম। শিল্পজগতের এই যে অরাজকতা, এই যে তালগোল পাকিয়ে চরকির মত ঘোরা—এর মধ্যে পরস্পর পাল্লা দেওয়ার মানেই হ'ল সামাল দেওয়া; একদিকের বাড়াবাড়িকে অন্যদিকের বাড়াবাড়ি দিয়ে ঢেকে দেওয়া।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের খরচ দিয়ে পণ্যের দাম যাচাই হয়ে থাকে। কেমন ক'রে তা হয়? হয় এইভাবে: একটা সময়ে জিনিসের দর উৎপাদনের খরচের চেয়ে যতখানি বেড়ে যায়, পরে একটা সময়ে আবার তেমনি জিনিসটার দর উৎপাদনের খরচের চেয়ে ততখানি কমে যায়; তেমনি আবার একটা সময়ে যতটা কমে যায়, পরে আবার ততটা বাড়ে। ফলে, বাড়া-কমার ভেতর দিয়ে জিনিসের দাম শেষ পর্যন্ত হরে-দরে উৎপাদনের খরচের সমান হয়ে দাঁড়ায়। কোন একটা বিশেষ পণ্যকে আলাদাভাবে দেখলে এ নিয়ম খাটবে না—কেবলমাত্র গোটা শিল্পের

বেলাতেই এ নিয়ম খাটবে। তেমনি আবার, কোন একজন বিশেষ মালিকের বেলায় এ নিয়ম খাটবে না—কেবলমাত্র গোটা মালিক শ্রেণীর বেলাতেই এ নিয়ম খাটবে।

দরকারী খাটুনির সময়

কোন একটা জিনিস তৈরি করতে কী কী লাগে? (১) প্রথমত কাঁচামাল এবং সেই সঙ্গে যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতি; এই জিনিসগুলো তৈরি করতে কাউকে না কাউকে কয়েক রোজ খাটতে হয়েছে—অর্থাৎ দুটোর পেছনে কিছু না কিছু খাটুনির সময় রয়েছে। (২) দ্বিতীয়ত লাগে খাটুনি; এই খাটুনিরও আবার মাপকাঠি হ'ল সময়।

দুটো যোগ করলে তাহ'লে দাঁড়ায়: একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাটুনির সময়—যা নইলে কোন জিনিস তৈরি হ'তে পারে না। উৎপাদনের খরচ ব'লতে বোঝায় তাহ'লে পণ্য তৈরির পক্ষে দরকারী খাটুনির সময়। উৎপাদনের খরচ=পণ্য তৈরির পক্ষে দরকারী খাটুনির সময়।

যখন আমরা বলি: পণ্যের দর যাচাই হয় উৎপাদনের খরচ দিয়ে, তখন আমরা সেই কথাটাকেই ঘুরিয়ে বলতে পারি এইভাবে—পণ্যের দর যাচাই হয় পণ্য তৈরির পক্ষে দরকারী খাটুনির সময় দিয়ে। একটা কথাই তাহ'লে ঘুরিয়ে দুভাবে বলা হ'ল। দুটোই তাহ'লে এক কথা। পণ্যের দর যাচাই হয় উৎপাদনের খরচ দিয়ে=পণ্যের দর যাচাই হয় পণ্য তৈরির পক্ষে দরকারী খাটুনির সময় দিয়ে।

গতর তৈরির খরচ

পণ্যের দাম যে নিয়মগুলো মেনে চলে, মানুষের গতরের দাম অর্থাৎ মজুরীও মোটামুটিভাবে সেই নিয়মগুলোই মেনে চলে।

চাহিদা আর যোগান কত কত, যারা গতর বেচছে সেই মজুর এবং যারা গতর কিনছে সেই মালিক, এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ফলে অবস্থাটা কী দাঁড়িয়েছে—এরই ওপর মজুরীর বাড়া-কমা নির্ভর করে। পণ্যের দরের যখন যেমন উঠতি-পড়তি হয়, সেই সঙ্গে সাধারণভাবে মজুরীরও তখন তেমন উঠতি-পড়তি হয়। এই উঠতি-পড়তির ভেতরেই খাটুনির দাম যাচাই হবে উৎপাদনের খরচ দিয়ে—পণ্য অর্থাৎ, গতর তৈরির পক্ষে দরকারী খাটুনির সময় দিয়ে।

গতর তৈরির খরচ—সে আবার কী ?

তার মানে, একজন মজুরকে মজুর হিসেবে জীইয়ে রাখা এবং তাকে মজুর হিসেবে গ'ড়েপিটে নেবার খরচ।

খাটুনির দাম

যে কাজে শিক্ষানবিশির সময় যত কম লাগে, সেই কাজে মজুরের উৎপাদনের খরচ তত কম পড়ে এবং তার খাটুনির দাম অর্থাৎ তার মজুরীও তত কম লাগে। অনেক শিল্প আছে, যেখানে খাটতে গেলে কাজ শেখার কোন দরকারই হয় না,

মজুরের দেহটা বজায় রাখতে পারলেই হয়ে যায়—সেখানে মজুরের উৎপাদনের খরচ ব'লতে বোঝায় শুধু সেইটুকু জিনিস, যেটুকু পেলে সে প্রাণে বেঁচে থেকে কাজ ক'রে যেতে পারে। বেঁচে থাকতে গেলে যেটুকু জিনিস নইলে নয়, সেইটুকু জিনিসের দামেই তা'হলে তার খাটুনির দাম যাচাই করা হবে।

মজুরের উৎপাদনের খরচের মধ্যে আরও একটা দিক বিচার করা হয়।

যন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতি

কোন কলের মালিক যখন উৎপাদনের খরচ এবং জিনিসের দাম হিসেব করে, তখন সে তার যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটাও হিসেবের মধ্যে ধরে। হয়তো সে এক হাজার টাকা দিয়ে একটা কল কিনেছে। দশ বছর ধরে চালানোর পর তার সেই কলটা যখন ক্ষয়ে ক্ষয়ে একদম নষ্ট হয়ে যাবে তখন তাকে বাতিল করতে হবে। তার একটা নতুন কল কেনার তখন দরকার হবে। না কিনলে চলবে না। কেননা তাহ'লে তার উৎপাদন ঠেকে থাকবে। নতুন কলের দাম পড়বে হাজার টাকা। বছরে একশো টাকা হ'লেই দশ বছরে হাজার টাকা হয়। সুতরাং প্রত্যেক বছরে সে যা উৎপাদন করে, তার দামের সঙ্গে একশো টাকা যোগ করলেই দশ বছরে তার হাজার টাকা উঠে আসবে। পুরনো ঝরঝরে কলের বদলে তার নতুন ঝকঝকে কল হবে।

পুরনোর জায়গায় নতুন

তেমনি গতর তৈরির খরচ হিসেব করবার সময় মজুরের দেহযন্ত্রের ক্ষয়ক্ষতির দিকটাও ধরা হয়। খেটে খেটে মজুরের গতর যখন প'ড়ে যায়, যখন সে মরে ফৌত হয়ে যায়, তখন তার খালি জায়গায় কাজ করবার জন্যে নতুন জোয়ান মজুর চাই। কে হবে সেই নও-জোয়ান মজুর? খেটে খেটে যাদের গতর প'ড়ে গেছে, খেটে খেটে মুখে রক্ত তুলে যারা মারা গেছে—তাদেরই ছেলেপুলেরা হবে সেই নও-জোয়ান মজুর। বাপ ম'রে গেলে ছেলেরা এসে কল চালাবে। মালিকের কল বন্ধ হবে না। তাই মজুরের গতর তৈরির খরচ হিসেব করবার সময় তার বংশরক্ষার খরচটাও ধরতে হবে।

সব-চেয়ে-কম মজুরী

যে একজন সাধারণ মজুর, তার বেঁচে থাকা এবং বংশ রক্ষার খরচটাই হ'ল তার গতর তৈরির খরচ। তাকে তার এই বেঁচে থাকা আর বংশরক্ষার খরচ চালাতে যে দামটা দিতে হয়, সেটাই তার মজুরী। এইভাবে যে মজুরী যাচাই করা হয়, তাকে বলা হয় সব-চেয়ে-কম মজুরী। কোন একজন দুজন মজুরকে আলাদাভাবে দেখলে দেখা যাবে, তাদের বেলায় এ নিয়ম খাটছে না—সে এবং খুঁজলে

তাদের মতন আরও লক্ষ লক্ষ মজুর পাওয়া যাবে, যারা বেঁচে থাকার মত এবং বংশরক্ষা করবার মত সব-চেয়ে-কম মজুরীটুকুও পায় না। কিন্তু যত মজুর আছে, তাদের সবাইকে মেলালে দেখা যাবে, সব-চেয়ে-কম মজুরীর নিয়মটা ঠিক ঠিক খেটে যাচ্ছে। গোটা মজুর শ্রেণীর মজুরী যদি এক জায়গায় করা যায় তা'হলে দেখা যাবে: তুলনায় যারা বেশী পায় আর যারা কম পায়, বেশী আর কমে কাটাকাটি হয়ে গিয়ে তাদের গড়পড়তা মজুরী সব-চেয়ে-কম মজুরীর কোঠায় এসে ঠেকেছে।

আর পাঁচটা পণ্যের মতই মজুরী জিনিসটাও কতকগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চলে। সে নিয়মগুলো মোটামুটি কী, তাও বোঝা গেল।

এবার মজুরী আর পুঁজির সম্পর্কটা একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

পাতানো সম্পর্ক



জিজ্ঞেস করলাম : "পুঁজি জিনিসটা কী, মশাই ?"

তার উত্তরে অর্থনীতির পণ্ডিতেরা বললেন : "পুঁজির মধ্যে থাকে কাঁচামাল, খাটবার যন্ত্রপাতি এবং জীবনধারণের যাবতীয় সামগ্রী—এদেরই আবার কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয় নতুন কাঁচামাল, নতুন যন্ত্রপাতি এবং জীবনধারণের নতুন নতুন সামগ্রী। পুঁজি ব'লতে এই যা-কিছু বোঝায়, তার সবটাই খাটুনির ফল, সবটাই হ'ল একসঙ্গে জমাট-বাঁধা খাটুনি। এই জমাট-বাঁধা খাটুনি দিয়েই আবার নতুন উৎপাদনের যোগাড়যন্ত্র করা হয়। এই জমাট-বাঁধা খাটুনির নামই হ'ল পুঁজি।"

উঁহু, উত্তরটা একেবারেই সুবিধের হ'ল না।

এ যেন কাউকে জিজ্ঞেস করা হ'ল : "নিগ্রো গোলামদের কথা শুনতে পাই—তারা কারা হে ?" সে জবাব দিল, "ওরা হ'ল যাকে বলে কালা আদ্‌মী।" অর্থনীতির পণ্ডিতদের উত্তরটাও হ'ল ঠিক সেই রকমের অর্থহীন।

নিগ্রোরা নিগ্রো তো বটেই। কিন্তু আসল কথা তা নয়।

প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া

আসলে কতকগুলো সম্পর্কের মধ্যে প'ড়ে তাদের গোলাম হ'তে হয়েছে। কাপড়ের কলে কাপড় বোনা হয়। কতকগুলো

সম্পর্কের মধ্যে ফেললে তবেই সেই কলটা হবে পুঁজি। সেই সম্পর্কের ভেতর থেকে যেই তাকে সরিয়ে আলাদা ক'রে ফেলা হ'ল, তখন আর সেই যন্ত্রটা পুঁজি রইল না। সেটা তখন শুধু একটা যন্ত্র। অভাব মেটাবার উপায়।

কিভাবে এই সব সম্পর্ক পাতানো হয় দেখা যাক। প্রকৃতির আছে অঢেল সম্পদ। তেমনি আবার মানুষের অভাবের অন্ত নেই। প্রকৃতির কাছ থেকে নিলে তবেই মানুষ তার অভাব মেটাতে পারে। কিন্তু সেটা ঠিক যে-রকমটি আছে, সে-রকমটি রাখা চলবে না—মানুষের ঠিক যে-রকমটি দরকার, তাকে গ'ড়েপিটে ঠিক সেই রকম ক'রে নিতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে যুঝে প্রকৃতিকে বদ্‌লাতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে এই যোঝার নামই খাটুনি।

মাটির নীচে আছে লোহা। মাটি খুঁড়ে সেই লোহা তুলে আনতে হয়। তারপর তাকে গলিয়ে নিখাদ ক'রে তা থেকে হাজারো জিনিস তৈরি করা হয়—ঢাউস ইঞ্জিন থেকে শুরু ক'রে এইটুকু একটু আল্‌পিন পর্যন্ত। মাটির নীচে লোহা ঠিক যে-রকমটি ছিল, সে-রকমটি থাকল না। যখন সেটা ঝাড়াইবাছাই করা হ'ল তখন হ'ল সেটা কাঁচামাল। তারপর আবার সেই কাঁচামাল দিয়ে তৈরী হ'ল রকমারি লোহার জিনিস।

একা নয়, একযোগে

মানুষ কিভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যোঝে? হাত, পা আর মাথা খাটিয়ে। কিন্তু যদি হাত, পা আর মাথা—তিনটে তিন দিকে

চলে, তাদের একটার সঙ্গে আরেকটার যদি কোন সম্পর্ক না থাকে—তাহ'লে প্রকৃতির সঙ্গে যোঝা যায় না। হাত, পা আর মাথার মধ্যে তাহ'লে কিছু একটা সম্পর্ক থাকা দরকার —নইলে মানুষ খাটতে পারে না।

কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে মানুষ কখনই একা যোঝে না। উৎপাদন কখনই একার দ্বারা সম্ভব নয়।

একথা শুনে হয়তো কেউ ব'লে বস্‌বে, "ব'ললেই শুনবো? আমাদের বেচারামকে তো দেখি একাই কাপড় বোনে।"

কিন্তু যে তাঁতটায় বেচারাম কাপড় বোনে, সে তাঁতটা কি অন্য কেউ করে নি? তাঁতটা বানিয়েছে কেনারাম। কেনারামও আবার সেই তাঁতটা তৈরি করতে রাম-শ্যাম-যদু-মধুর সাহায্য নিয়েছে। কেননা, যে কাঠটায় তাঁত তৈরি হয়েছে, সেই কাঠ কেউ না কেউ নিশ্চয় বয়ে এনেছে। আবার সেই কাঠ বনের মধ্যে নিশ্চয় অন্য কেউ কেটেছে। এমনি ভাবে একজনের কাজের সঙ্গে অন্যদের কাজ যেন হাত ধরাধরি ক'রে পরস্পরকে জড়িয়ে আছে। রাম-শ্যাম-যদু-মধু যদি কাঠ কেটে ব'য়ে না আনত, কেনারাম যদি সেই কাঠ দিয়ে তাঁত তৈরি না করত—তাহ'লে বেচারামকে আর কাপড় বুনতে হ'ত না! হাত গুটিয়ে ব'সে থেকে কড়িকাঠ গুনতে হ'ত। কপালে তার কাণাকড়িও জ টত না।

উৎপাদনের সম্পর্ক

মানুষ তাহ'লে একা কাজ করে না। মিলে মিশে কাজ করে। এর কাজ ওকে দেয়, ওর কাজ একে দেয়—মানুষে মানুষে

কাজের দেওয়া-নেওয়া হয়। উৎপাদনের জন্যে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে কোন না কোন সম্পর্কে আসে। সম্পর্কটা দু'রকমের হ'তে পারে। শোষণ থাকলে এক, শোষণ না থাকলে আর এক। নিজে না খেটে অন্যের খাটুনির ফল ভোগ করাই—অর্থাৎ, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার নামই শোষণ। যেখানে শোষণ নেই, সেখানে মানুষে মানুষে ভাইবন্ধুর সম্পর্ক। যেখানে শোষণ আছে, সেখানে মানুষে মানুষে দমন-পীড়নের সম্পর্ক। মানুষ যখন একে অন্যের সঙ্গে জোট বাঁধে আসে, একমাত্র তখনই প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে পারে। একমাত্র তখনই উৎপাদন সম্ভব হয়।

উৎপাদনের এই বিশেষ বিশেষ সম্পর্কের ওপরই গ'ড়ে ওঠে বিশেষ বিশেষ সামাজিক সম্পর্ক—যার অন্য নাম সমাজ।

উৎপাদনের শক্তি

উৎপাদনের সম্পর্ক চিরকাল এক থাকে না। ক্রমাগত বদ্‌লায়। কিভাবে তা বদ্‌লায় জানবার আগে জেনে নেওয়া যাক উৎপাদনের শক্তি কাকে বলে।

বাঁচবার জন্যে যা যা লাগে, প্রকৃতির কাছ থেকে তা আদায় করবার জন্যে মানুষ এ-ওর সঙ্গে জোট তো বাঁধল। কিন্তু আদায় করবার উপায়টা কী? আদায় হবে কিসের জোরে? তার জন্যে চাই যন্ত্রপাতি আর সেইসব যন্ত্রপাতি চালাবার মত চৌকশ কাজের লোক। এগুলো থাকলে তবেই আদায়ের জোর হয়। এই জোরই হ'ল উৎপাদনের শক্তি।

উৎপাদনের এই শক্তির সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কের টিকি বাঁধা থাকে। উৎপাদনের শক্তি যখন যেমন বদ্‌লায়, উৎপাদনের সম্পর্কও তখন তেমন বদ্‌লায়। উৎপাদনের শক্তি যখন যে অবস্থায় থাকে, উৎপাদনের সম্পর্কও তখন সেই অবস্থায় থাকে।

সমাজের চাবিকাঠি

উৎপাদনের শক্তি কোন্ অবস্থায় আছে জানতে পারলে, মানুষের হাতে তখন উৎপাদনের কী হাতিয়ার আছে—তাও জানা যায়। তেমনি উৎপাদনের সম্পর্ক কোন্ অবস্থায় আছে জানতে পারলে, উৎপাদনের উপায় কার দখলে আছে তাও জানা যায়।

উৎপাদনের এই শক্তি যুগে যুগে বদ্‌লেছে। তার তালে তাল রেখে সামাজিক সম্পর্ক বা সমাজও বদ্‌লেছে। ইতিহাসে প্রধানত পাঁচ রকমের সমাজ এ পর্যন্ত দেখা গেছে : আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ এবং সব শেষে সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

দশচক্রে ভুত

এবার পুঁজির কথায় তাহ'লে ফিরে আসা যাক।

পুঁজি ব'লতে তাহ'লে বোঝায় বিশেষ এক ধরনের সামাজিক উৎপাদনের সম্পর্ক অর্থাৎ, পুঁজিবাদী উৎপাদনের সম্পর্ক।

পুঁজির মধ্যে পড়ে জীবনধারণের সামগ্রী, খাটবার যন্ত্রপাতি আর কাঁচামাল। এর কোনটাই আকাশ থেকে পড়েনি, হাওয়ার মধ্যেও দাঁড়িয়ে নেই। একটা বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে জিনিসগুলো তৈরি করা হয়েছে, জমানো হয়েছে। সেই সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে থেকেই এরা আবার নতুন উৎপাদনেরও মালমশলা হচ্ছে। বিশেষ ধরনের ঐ সামাজিক সম্পর্কটাই এদের পুঁজি হিসেবে দাঁড় করাচ্ছে। জীবন-ধারণের সামগ্রী কিম্বা খাটবার যন্ত্রপাতি কিম্বা কাঁচামাল আলাদা ক'রে দেখলে এরা কেউই পুঁজি নয়। এরা প্রত্যেকেই হ'ল মানুষের অভাব মেটাবার উপায়। কিন্তু একটি বিশেষ সমাজে অবস্থার চাপে প'ড়ে এরা পুঁজি হয়েছে। দশচক্রে ভগবান ভূত হয়।

পুঁজির লুকোচুরি

যে জিনিসগুলো যোগ করলে পুঁজি হ'চ্ছে, তার সব কটাই হ'ল পণ্য। পুঁজি তাহ'লে ভিন্ন ভিন্ন পণ্যের যোগফল। সব পণ্যেরই বদ্‌লী-মূল্য বা দাম আছে। পুঁজি তাহ'লে ভিন্ন ভিন্ন বদ্‌লী-মূল্য বা দামের যোগফল।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ; একদিকে যেমন পুঁজি ব'লতে বোঝায় এমন এমন জিনিস যা বস্তুর মধ্যে আছে—খোরাকপোশাক, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ; তেমনি আবার অন্য দিকে, পুঁজি ব'লতে বোঝায় এমন এমন জিনিস যা বস্তুর আড়ালে আছে—পণ্য, বদ্‌লী-মূল্য, দাম। একবার বস্তুর মধ্যে থেকে, একবার বস্তুর আড়ালে গিয়ে পুঁজি যেন লুকোচুরি খেলে।

রেশম সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় তুলো, গমের বদলে চাল, রেলগাড়ীর বদলে জাহাজ এনে যদি বসানো যায়, তাহ'লেও পুঁজির কিছুই নড়চড় হবে না—পুঁজি যেমন ছিল তেমনি থাকবে। শুধু দেখতে হবে—পুঁজি যার ওপর ভর ক'রে ছিল এবং তার জায়গায় যাকে পুঁজির বাহন করা হচ্ছে, দুটোর বদ্‌লী-মূল্য অর্থাৎ দুটোর দামটা যেন সমান হয়। নাকের বদলে যেন নরুন দেওয়া না হয়।

গতরের ঘাড়ে পণ্য

পুঁজি যদিও পণ্যের যোগফল, কিন্তু তাই ব'লে পণ্যের যোগফলমাত্রই পুঁজি নয়।

একগাদা পণ্য এসে যদি বলে, "আমরা পুঁজি হবো," হবো ব'ললেই অমনি পুঁজি হওয়া যায় না। যোগ করলেই যেমন পুঁজি হবে না, তেমনি যোগ না করলেও পুঁজি হয় না। তাকে তাই তখন বলা হবে, "পুঁজি হ'তে চাও তো পুণ্য করোগে যাও।"

পণ্যের সেই দলটা বেরোল পুণ্য করতে। সেই দলের সঙ্গে রাস্তায় একদল হাভাত-হাঘরে গতরের সঙ্গে দেখা—গতরটুকু ছাড়া তাদের নিজের ব'লতে আর কিছুই নেই। তারা কোনরকমে নিজেদের টিঁকিয়ে রাখতে চায়। পণ্যের দল ব'লল, "বেশ ভাল কথা, তোমরা আমাদের জন্যে খাটো, তোমাদের আমরা তার বদলে টিঁকিয়ে রাখব।" গতরের দল বাঁচবার তাগিদে তাতে রাজী হয়ে গেল। ক্রমে দেখা

গেল, পণ্যের দল সেই গতরের দলটাকে খাটিয়ে নিজেরা দিব্যি পায়ে পা তুলে দিয়ে ব'সে খাচ্ছে। দিন দিন তাদের পেট মোটা হ'য়ে ওঠে। সমাজের একটা অংশের দখল তারা বজায় রাখে। দিনকে দিন সেই দখল তারা বাড়িয়ে তোলে। তখন গিয়ে সেই পণ্যের দলটাকে বলা হবে, "পুণ্যের জোরে তোমরা এখন পুঁজি হয়েছো।" আমরা বলি, পরকে শোষণ করলে পাপ। কিন্তু একটা বিশেষ সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে তাদের সেই পাপটাই পুণ্য ব'লে ধরা হচ্ছে।

মরা এবং জ্যান্ত

পণ্যের দলটাকে গতরের দলটার ঘাড়ে চাপতে হচ্ছে পুঁজি হবার জন্যে। পণ্যের মানেই হ'ল আগেকার জমা একদলা খাটুনি—যে খাটুনিটা আগেই খাটা হয়ে গেছে। আগেকার জমা খাটুনি এখনকার চালু খাটুনির ঘাড়ে চেপে পুঁজি সেজে ব'সছে। আগেকার জমা খাটুনিটা হ'ল মরা খাটুনি। এখনকার চালু খাটুনিটা হ'ল জ্যান্ত খাটুনি। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে মরা খাটুনির যে ভূতটা জ্যান্ত খাটুনির ঘাড় মট্‌কে খাচ্ছে সেই পিশাচটার নামই হ'ল পুঁজি।

এখনকার চালু খাটুনি নতুন উৎপাদনের জন্যে আগেকার জমা খাটুনিকে যদি কাজে লাগায়—তাহ'লে জমা খাটুনিকে পুঁজি ব'লে ধরা হবে না। আগেকার জমা খাটুনি যখন নিজেকে বজায় রেখে আরও ফুলে ফেঁপে উঠবার জন্যে এখনকার চালু খাটুনিকে কাজে লাগায়, একমাত্র তখনই সেই

জমা খাটুনিটাকে পুঁজি ব'লে ধরা হবে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে জ্যান্ত খাটুনি যদি নতুন ধনদৌলত গড়বার জন্যে মরা খাটুনির ভূতটাকে কানে ধ'রে খাটিয়ে নেয়, তাহ'লে কিন্তু সেই মরা খাটুনির ভূতটা পুঁজি হয় না; মরা খাটুনির ভূতটা গ্যাঁট হয়ে ব'সে নিজেদের দাপট বাড়াবার জন্যে যখন জ্যান্ত খাটুনিকে কানে ধরে খাটিয়ে নেয়, শুধু তখনই সেই মরা খাটুনির ভূতটা পুঁজি হয়।
ছড়া কেটে ব'ললে ব্যাপারটা তাহ'লে দাঁড়াল এই:

পণ্য যেই গতরে ভর
ক'রল সোজাসুজি।
বদ্‌লে গেল চেহারা তার
পণ্য হ'ল পুঁজি॥

এবার মজুরী আর পুঁজির মধ্যেকার সম্বন্ধটা দেখা যাক। তাদের পরস্পরের দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে মোটমাট কী দাঁড়ায়?

হারানো-প্রাপ্তি

মালিক মজুরকে শুধু বাঁচবার যোগাড়টুকু ক'রে দিচ্ছে। তার বদলে মজুরের কাছ থেকে মালিক কী পাচ্ছে? মালিক পাচ্ছে মজুরের খাটুনি, তার সৃষ্টি করবার ক্ষমতা—যার জোরে মজুর তার নিজের বাবদ খরচ-হওয়া অংশটুকু ফিরিয়ে তো দেয়ই, উপরন্তু জমা খাটুনির মূল্য আগে যা ছিল তার চেয়ে আরও বাড়িয়ে দেয়।

দিনগুজরানোর জন্যে মজুর যেটুকু পায়, সেটা মালিকের তবিল থেকেই আসে। মজুর দিন আনে দিন খায়। বাঁচবার রসদটুকু তাকে পেয়েই খরচ করতে হয়। যেই আমি বাঁচবার রসদ খরচ করছি, অমনি আমায় বরাবরের মত তা হারাতে হচ্ছে; আমাকে তা হারাতে হয় না, যদি আমি রসদের জোরে বেঁচে থাকার সময়টুকু নতুন রসদ উৎপাদনের কাজে দিতে পারি, যদি আমি খরচ করার সময়টুকুর মধ্যে খেটেখুটে নতুন সব মূল্য দিয়ে খুইয়ে-ফেলা মূল্যগুলো পুষিয়ে নিতে পারি। কিন্তু নতুন সৃষ্টি করবার সেই ক্ষমতাটাকে মালিকের হাতে তুলে দিতে হয়েছে মজুরকে। তার বদলেই তো তার বাঁচবার রসদটুকু জুটেছে। মজুর তাই তার পেয়ে-যাওয়া রসদটুকু যেই খুইয়ে ফেলল, অমনি সে ফতুর হয়ে গেল—ভাঁড়ারে তার বাঁচবার রসদ নিজের ব'লতে কিছুই আর রইল না।

সাতকড়ি আর হারাধন

যেমন ধরা যাক, ভুবনডাঙা গাঁয়ের জমির মালিক সাতকড়ি পাঁজা আর সেই গাঁয়ের এক ক্ষেতমজুর হারাধন দাসের কথা। তাঁর জমিতে একদিন জন খাটলে সাতকড়িবাবু হারাধনকে এক টাকা ক'রে দেন। এক টাকার জন্যে হারাধন সারাদিন সাতকড়িবাবুর জমিতে খাটছে। দিনের শেষে হারাধনের কাছ থেকে সাতকড়িবাবু দু টাকার মত কাজ পাচ্ছেন। অর্থাৎ হারাধন পাচ্ছে এক টাকা, দিচ্ছে

তু টাকা। সাতকড়িবাবু হারাধনকে যে-মূল্যটা দিচ্ছেন, সেটা তো তাঁর হাতে ফিরে আসছেই—উপরন্তু সেই মূল্যটা ডবল হয়ে ফিরে আসছে। অর্থাৎ, সাতকড়িবাবু দিচ্ছেন এক টাকা, পাচ্ছেন তু টাকা। তা'হলে দেখা যাচ্ছে, সাতকড়িবাবু তাঁর একটা টাকা খরচ ক'রে ফুঁকে দেননি—খরচ করেছেন এমনভাবে যাতে কাজ হয়; যাতে টাকাটার আদায় হয়। এক টাকা দিয়ে তিনি হারাধনের যে খাটুনি ও গতর কিনছেন, হারাধন তার সেই খাটুনি ও গতর দিয়ে ঐ এক টাকার ডবল মূল্যের ফসল তৈরি করছে। যেটা ছিল এক টাকা, তাকে সে তু টাকা করছে। হারাধনের সঙ্গে সাতকড়িবাবুর আগেই ঠিক হয়ে আছে, হারাধন গতর খাটিয়ে যে-ফসলটা ফলাবে সে-ফসল উঠবে সাতকড়িবাবুর গোলায়। হারাধন তার সেই গতরের বদলে পেল একটা টাকা। বাঁচবার যোগাড় করতে, নুনভাতে ছেঁড়া কাপড় জোটাতে সেই একটা টাকা তার প্রায় তক্ষুণি গ'লে গেল।

এপিঠ-ওপিঠ

তা'হলে দেখা যাচ্ছে টাকা একটাই—কিন্তু খরচ হচ্ছে তুভাবে। সাতকড়িবাবু খরচ ক'রে ফল পাচ্ছেন; তিনি তাঁর একটা টাকা দিয়ে পাচ্ছেন হারাধনের গতর, যেটা তাঁকে তু টাকা ফিরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু হারাধন খরচ ক'রে তার টাকাটা বরাবরের মত খুইয়ে ফেলছে; সে তার একটা

টাকায় যা সওদা করেছিল, তা খেয়েপ'রে ফুরিয়ে ফেলেছে। যদি এখন হারাধনকে তার টাকার মূল্য ফিরে পেতে হয়, যদি তাকে খেয়ে প'রে বাঁচতে হয়—আবার তাকে সাতকড়িবাবুর দুয়োরে গতর বেচতে ছুটতে হবে। হারাধনকে মজুরী করতে হবে। অন্যদিকে আবার চাষবাসের জন্যে খাটুনি পেতে গেলে সাতকড়িবাবুরও হারাধনকে চাই। সাতকড়িবাবুকে পুঁজি খাটাতে হবে।

পুঁজি থাকলেই মজুরী থাকতে হবে; মজুরী থাকলেই পুঁজি থাকতে হবে। একটি আরেকটিকে ছাড়া বাঁচতে পারে না; একটি এলেই অমনি আরেকটি আসে--কান টানলে যেমন মাথা আসে।

এরপরও যদি মজুরী আর পুঁজির সম্পর্কটা কারুর মাথায় না ঢোকে, তাহ'লে হয়তো চ'টে গিয়ে ছড়া কেটে—

ও পুঁজি বলবে,
"এও বোঝ না, স্টুপিড ?
আমরা যেন একই টাকার
এ-পিঠ এবং ও-পিঠ।"

কাপড়-কলে যে মজুর কাজ করে, সে কি শুধু কাপড়ই বানায়? না। যেমন সে কাপড় বানায়, তেমনি সে পুঁজিরও জন্ম দেয়। যে মূল্য সে তৈরি করে, সেই মূল্যই আবার তাকে কানে ধ'রে খাটায়, তাকে খাটিয়ে তার কাছ থেকে আবার নতুন মূল্য আদায় ক'রে নেয়।

মজুরী-করা গতরের সঙ্গে নিজেকে দেওয়া-নেওয়া ক'রেই পুঁজি নিজেকে বাড়িয়ে তোলে। মজুরী-করা গতর নিজেকে

পুঁজির সঙ্গে দেওয়া-নেওয়া ক'রে পুঁজিকেই আবার বাড়িয়ে দেয়—যে তাকে বেঁধে রেখেছে, তার হাতই শক্ত করে। পুঁজি বাড়লে সঙ্গে সঙ্গে মজুরের দলও বাড়ে।

'স্বার্থ এক'

এবার মালিকের দল এবং তাদের পোঁ-ধরা পণ্ডিতরা হাত-তালি দিয়ে ব'লে উঠবে, "তবেই তো দেখ বাপু, মালিক আর মজুরদের স্বার্থ এক।"

বটেই তো! মালিক কাজ না দিলে মজুর বাঁচে না। তেমনি মজুরের গতর শুষতে না পারলে মালিকের পুঁজিও পটল তোলে—শুষবার জন্যে মালিককে তাই মজুরের গতরটা কিনে নিতে হয়। উৎপাদনের জন্যে মালিকরা যত তাড়াতাড়ি যত বেশী পুঁজি খাটাবে—ততই কলকারখানা বাড়বে, মালিকরা টাকা পিটবে, ব্যবসা ফলাও হবে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মালিকরা আরও বেশী বেশী মজুর চাইবে, মজুরদের দরও বেড়ে যাবে।

উৎপাদনের পুঁজি যত তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়, ততই ভাল—কেন না, তাতে মজুরের নিদেন বাঁচবার রাস্তাটা একটু খোলসা হয়, মজুর একটু সোয়াস্তি পায়।

কিন্তু উৎপাদনের পুঁজি বাড়াবার মানে কী? তার মানে জমা খাটুনি চালু খাটুনির ওপর আরও বেশী ক'রে জোর খাটাতে পারবে। মরা খাটুনির ভূতটা জ্যান্ত খাটুনির ঘাড় আরও বেশী ক'রে মটকাতে পারবে। মজুরের ওপর মালিকের

দাপট বেড়ে যাবে। মজুরের গতরটার ঘাড়ে ব'সে আছে তার দুশমন পুঁজি। মজুর যদি তার হয়ে ধনদৌলত তৈরি করে দেয়, তাহলে কাজ জুটবার ভাত জুটবার উপায়টুকু তার দুশমনের কাছ থেকে তার হাতে সটান ফিরে আসে। এর মধ্যে অবশ্য একটা 'কিন্তু' থেকে যায়। সেই 'কিন্তু'টা এই : দুশমনটা যদি নতুন ক'রে নিজেকে পুঁজির এমন একটা অংশ করে তোলে, নিজেকে দিয়ে যদি এমন একটা হাতল বানায় যা পুঁজিকে নতুন করে সপাটে ঠেলে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেবে—অর্থাৎ, পুঁজি যদি নিজেকে নতুন করে খাটায় একমাত্র তবেই মজুরের কাছে তার কাজ পাবার উপায়টুকু ফিরে আসবে। নইলে নয়।

মজুর আর মালিকের স্বার্থ এক—এ কথা বলার মানেই হ'ল মজুরী আর পুঁজির পিঠোপিঠি সম্পর্কটার কথা ঘুরিয়ে বলা। একটির আরেকটিকে ছাড়া চলে না, একটি থাকলেই আরেকটি থাকে।

মজুর যতক্ষণ মজুরী ক'রে খাচ্ছে, ততক্ষণ তার ভালমন্দ পুঁজির হাতে। মালিক আর মজুরের স্বার্থের যে মিল নিয়ে এত গলাবাজি, সে মিলটুকু শুধু ঐখানে।

মজুর খেয়ে বাঁচতে চায়, পুঁজিও খেয়ে খেয়ে মোটা হ'তে চায়। তারা এ-ওর কাছে আসে। তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে পিঠো-পিঠি সম্পর্ক। কিন্তু সম্পর্কটা ভাই-ভাই সম্পর্ক নয়, খাই-খাই সম্পর্ক। তারপরই যেটা দাঁড়ায়, সেটা হ'ল তাদের খাওয়া-খাওয়ি সম্পর্ক।

এবার সেই কথায় আসা যাক।

পুঁজি যেমন বাড়ে, তার সঙ্গে সঙ্গে গতর-খাটা মজুরের দলও ভারী হয়। মজুরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় পুঁজি আরও বেশী বেশী লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসে। ধরে নেওয়া যাক, রকমারি কারবারে এত বেশী পুঁজি খাটতে শুরু করল যে তার জন্যে বিস্তর মজুরের দরকার হল। মজুরের এই চাহিদার ফলে দেখা গেল মজুরীও বেড়ে গেছে।

চারপাশে সকলেরই যখন মাটির ঘর তখন মাটির ঘরে থাকতে কারো অস্বস্তি হয় না। সবাই তাদের ঘরগুলোকে বেশ বসবাস করবার যুগ্যি বলেই মনে করে। কিন্তু যেই সেখানে ইঁটের একটা তিনতলা দালান উঠল, অমনি যাদের মাটির ঘর তারা মনে করতে লাগল: "আরে রামো, মাটির ঘরে মানুষে থাকে? এর চেয়ে খোলা আকাশের নীচে গিয়ে থাকলেই হয়! আমরাও যেমন!" এরপর একটা সময় হয়তো আশপাশের সব বাড়ীগুলোই একতলা ইঁটের দালান হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল, ততদিনে তিনতলা বাড়ীটা পাঁচতলা প্রাসাদ হয়ে উঠেছে। যাদের বাড়ী একতলা, অমনি তারা উস্‌খুস্‌ ক'রে উঠল। মনে মনে তারা বলতে লাগল, "আরে ছোঃ, এমন বাড়ীতে মানুষে থাকে! এমন বাড়ীতে থাকার চেয়ে বনে গিয়ে বাস করলেই হয়! আর আমাদেরও বলিহারি, এমন বাড়ীতে থাকি কোন্‌ সুখে!" এরপর কোন সময় একতলা বাড়ী যদি দোতলা হয়, তাতেও দোতলা বাড়ীর লোকগুলো কিছুতেই মনে শান্তি পাবে না। কেননা ততদিনে

পাঁচতলা বাড়ীটা হয়ে গেছে দশতলা কিম্বা আরও উঁচু একটা অলকাপুরী। দোতলা বাড়ীর লোকগুলোর অভাববোধ এবং অভিযোগ আরও বেড়ে যাবে। তারা নিজেদের আরও বেশী অসুখী বলে মনে করবে। মনে করবে বাড়ীটাতে যেন তাদের দম আটকে আস্‌ছে।

কলকারখানায় রকমারি কারবারে যখন হু হু করে পুঁজি খাটতে থাকে, কেবলমাত্র তখনই মজুরী তেমন কিছু বাড়ে। উৎপাদনের দরোজা যতই হাট হয়ে খুলে যায়, ততই ধন-দৌলত চকমকিয়ে ওঠে, শখশৌখিনতার হাওয়া বয়, সামাজিক প্রয়োজন বাড়ে, সামাজিক সুখসুবিধে বেশী হয়। মজুরও আগের চেয়ে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারে। কিন্তু তার সোয়াস্তির চেয়ে মালিকের সুখ এত বেশী বেড়ে যায় যে, তার নাগাল পাওয়া সমাজের এই হাল থাকতে সম্ভবই নয়। ফলে, মজুর কিছুটা সুখসুবিধে পেয়েও তাতে সামাজিক তৃপ্তিটুকু পায় না, সুখের স্বাদ পায় না। বরং ভোগের চেয়ে ভোগান্তি বাড়ে। খুঁতখুঁতুনি, নালিশের মাত্রা বেড়েই যায়। বেড়ে যাবারই কথা ; কেননা আমাদের কিসের অভাব, কিসে আমাদের সুখসুবিধে—সে বোধটুকু সমাজ থেকেই আসে। কাজেই সমাজের মাপকাঠি দিয়েই আমরা আমাদের অভাব অভিযোগ, সুখসুবিধে বিচার করি। অভাব মেটাবার জন্যে, সুখসুবিধে ভোগ করার জন্যে যে জিনিসগুলো পাচ্ছি —সেই জিনিসগুলো দিয়ে এই বিচার করা যায় না যে, তাতে আমাদের অভাব মিটছে কি মিটছে না, সুখসুবিধে হচ্ছে কি হচ্ছে না। আমাদের প্রয়োজনটা সামাজিক প্রয়োজন,

আমাদের সুখসুবিধেটুকুও সামাজিক সুখসুবিধে—তাই তারা আপেক্ষিক। তুলনায় কমবেশি।

মজুর তার মজুরীর বদলে কতটা কী জিনিস পাচ্ছে শুধু তাই দিয়েই তার মজুরীর বিচার হয় না। মজুরী বিচার করতে গেলে আরও কয়েকটা দিক দেখা দরকার।

মজুর তার মজুরী পাচ্ছে নগদ টাকা-আনা-পয়সায়। তাহ'লে কি শুধু টাকা-আনা-পয়সা দিয়েই তার মজুরী যাচাই হবে?

প্রশ্নটাকে একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

মুনাফার রণ-পা

আজ থেকে চার শো বছর আগে মার্কিন মুলুকে ভারি মজার এক ব্যাপার ঘটল। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ তার নীচে বিস্তর সোনা পাওয়া গেল। খনি থেকে সেই সোনা তুলে আনার হাঙ্গামাও অনেক কম। তাল-তাল সেই সোনা যেই বিলেতের বাজারে ছাড়া, অমনি দেখতে দেখতে সোনা-চাঁদির মূল্য পণ্যের মূল্যের তুলনায় হু হু ক'রে প'ড়ে গেল। চাঁদির টাকা চাঁদির টাকাই থাকল, কিন্তু তার আর সেই কদর রইল না। একটা চাঁদির টাকা বাজারে গিয়ে দাঁড়ালেই আগে পাঁচটা জিনিস ছুটে আসত, কিন্তু এখন দেখা গেল হুটো কি তিনটের বেশী আসছে না। মজুর তার গতর বেচে যেটুকু চাঁদির টাকা পাচ্ছিল, তার কোন নড়চড় হ'ল না; কিন্তু তার মজুরী কমে গেল। আগে যেটুকু চাঁদির টাকা দিয়ে যেটুকু জিনিস সে পাচ্ছিল, তার সেই টাকাটা ঠিকই থাকল—কিন্তু সেই টাকায় সে কম-কম জিনিস পেতে লাগল। এটাও একটা কারণ ছিল, যার দরুন সেই সময় পুঁজির বেজায় বাড়বাড়ন্ত হল, মালিক শ্রেণী মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বাজারের ওঠাপড়া

শুধু এ ব্যাপার নয়। আরও একটা ঘটনার কথা তাহলে বলতে হয়। শতখানেক বছর আগে একবার দারুণ অজন্মা

হ'ল। চাল-আটা পাওয়া যায় না। তরিতরকারি, মাছ-মাংস, দুধ-ঘির দাম আগুন হ'ল। সেই সময়কার একজন মজুরের কথা ধরা যাক। বাজারে জিনিসের দাম বেড়েছে, কিন্তু তার মজুরী যা ছিল তাই আছে। সে যখন বাজারে যায়, দেখে একই টাকায় আগের চেয়ে ঢের কম চাল-আটা, শাক-শব্জি মিলছে। তার মানে, টাকার অঙ্কটা ঠিক থাকলেও তার মজুরী কমে গেছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, মজুরী কমবার কারণ সোনা-চাঁদির মূল্য কমে যাওয়া নয়; বাঁচতে গেলে যা নইলে নয়, সেইসব জিনিসের মূল্য বেড়ে যাওয়াই মজুরী কমবার কারণ।

এবার অন্য একটা অবস্থার কথা ধরা যাক। যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্যি রাজা পুণ্যি দেশ—খনার এই বচনটা এক সময় ফলে গেল। বাজারে চাল-আটা-তরিতরকারি বেজায় শস্তা। এমন সব নতুন কল এনে বসানো হ'ল যে, কলে-তৈরি জিনিসের দামও হু হু করে পড়ে গেল। ফলে, মজুর দেখল একই টাকায় আগের চেয়ে সে বেশী বেশী রকমারি জিনিস পাচ্ছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, মজুরীর মুদ্রামূল্য ঠিক থাকার ফলেই তার মজুরী বেড়ে গেছে।

নামমাত্র, আসল

খাটুনীর যে দামটা টাকা-আনা-পয়সায় দেওয়া হচ্ছে, সেটা নামমাত্র-মজুরী। মজুরীর বদলে মজুররা আসলে যে জিনিস-গুলো পাচ্ছে, সেটাই হল আসল-মজুরী। তাহলে দেখা

গেল, এই নামমাত্র-মজুরী আর এই আসল-মজুরী দুটো এক নয়। তাই মজুরী বাড়া-কমার কথা যখন ওঠে, তখন শুধু নামমাত্র-মজুরীর কথাটাই মনে রাখলে চলবে না।

নামমাত্র-মজুরী আর আসল-মজুরী ছাড়াও মজুরীকে বাজিয়ে নেবার আরও দিক আছে।

আপেক্ষিক মজুরী

দেখতে হবে মালিক নিজের কোলে কতটা ঝোল টানছে, মালিকের লাভ হচ্ছে কত। এইভাবে মালিকের লাভের সঙ্গে মজুরী তুলনা করলে পাওয়া যায় আপেক্ষিক-মজুরী।

আসল-মজুরী কী বলে? বলে, আর পাঁচটা জিনিসের দামের তুলনায় খাটুনির দাম কত। আপেক্ষিক-মজুরী কী বলে? বলে, সরাসরি গতর খাটিয়ে যে নতুন মূল্য তৈরি হচ্ছে, তাতে পুঁজির বখরার তুলনায় কাজে-লাগা গতরের বখরা কত।

হাল্কা ক'রে ছড়া কেটে আসল-মজুরী যেন বলছে :

যে দামে আর পাঁচটা জিনিস
বাজারে কিনলাম—
তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি
খাটুনির কী দাম ॥

তেমনি তার সুরে সুর মিলিয়ে আপেক্ষিক-মজুরীও যেন বলছে :

তৈরি করা নতুন মূল্যে
পুঁজির ভাগ দেখে—

খাটুনি কত বখরা পায়
বলছি আমি হেঁকে।

আগের পণ্যে

এইখানে গোড়ার দিকের একটা কথা ঝালিয়ে নেওয়া যাক। মজুর যে পণ্যটা তৈরি করছে সেই পণ্যেরই একটা অংশ তার মজুরী নয়। যেসব পণ্য আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে, তারই একটা অংশ দিয়ে মালিক মজুরের গতরের খানিকটা কিনে নিয়ে কাজে লাগায়—আগে থেকে তৈরি পণ্যের সেই অংশটা হল মজুরী।

গতরটাকে খাটিয়ে মজুর
করছে যা উৎপন্ন।
তার অংশ মজুরী ব'লে
ক'রো না যেন গণ্য॥

আগের তৈরি পণ্যে মালিক
গতর নিচ্ছে কিনে।
তারি একটি অংশকে নাও
মজুরী ব'লে চিনে॥

যেটা যোগ হয়

মালিক তো মজুরী দিচ্ছে, কিন্তু যেটা দিচ্ছে, সেটা উশুল করবে কেমন ক'রে? মজুর যে মাল তৈরি করছে, তার দাম থেকে। উশুল করবে এমনভাবে যাতে তৈরি করার

খরচখরচা বাদ দিয়েও হাতে কিছু বাড়তি থেকে যায়, যাতে লাভ উঠে আসে। মজুর যে মালগুলো তৈরি করবে তার বিক্রির দামটা মালিকের কাছে তিন অংশে ভাগ হবে :
(১) প্রথমত, খরিদ-করা কাঁচামালের দাম এবং সেই সঙ্গে খাটুনির হাতিয়ার, কল, যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতির দাম পুষিয়ে নেওয়া ; (২) দ্বিতীয়ত, যে মজুরীটা দেওয়া হয়েছে সেটা উশুল ক'রে নেওয়া ; (৩) তৃতীয়ত, যেটা বাড়তি থাকছে, যেটা মালিকের লাভ। প্রথম অংশে শুধু পুষিয়ে নেওয়া হবে সেইসব মূল্য, যা আগে থেকেই ছিল। পরের দুটো অংশের বেলায় সে কথা খাটে না। মজুর তার খাটুনির জোরে যে নতুন মূল্য সৃষ্টি করছে, যেটা যোগ হচ্ছে কাঁচামালের সঙ্গে—তা থেকেই উঠে আসবে একই সঙ্গে মজুরের মজুরী এবং মালিকের হাতে বাড়তি থেকে যাওয়া লাভ। মজুরী আর লাভের মধ্যে তুলনা করতে গেলে এই কথাটা মনে রাখতে হবে। এই দিক থেকে বলা যায় : মজুর যা তৈরি করে, মজুরী আর লাভ হ'ল তারই বখরা।

পুঁজির দাপট

আসল-মজুরী এক থাকতে পারে, এমন কি বেড়েও যেতে পারে—কিন্তু তা সত্ত্বেও আপেক্ষিক-মজুরী কমে যায়। ধরা যাক, বাজারে জীবনধারণের জিনিসপত্তরের দাম হঠাৎ খুব প'ড়ে গেল ; বেঁচে থাকতে গেলে দিনে খরচ হচ্ছিল তিন টাকা—এখন দেখা গেল, শস্তার বাজারে খরচ পড়ছে

এক টাকা। সঙ্গে সঙ্গে মজুরীও প'ড়ে গেল। চটকলে কিম্বা কাগজকলে কিম্বা রশিকলে যে মজুর কাজ করে তার রোজ ৩৲ টাকা থেকে কমে ২৲ টাকা হ'ল। তার মানে, একজন মজুর তিন টাকা খরচ ক'রে বেঁচে থাকার যা জিনিস পাচ্ছিল, তার চেয়ে দু টাকায় এখন সে বেঁচে থাকার জিনিস ঢের বেশী পাচ্ছে, তা সত্ত্বেও মালিকের লাভের তুলনায় কিন্তু মজুরের মজুরী কমে গেছে। মজুরকে ৩৲ টাকা দিয়ে মালিকের লাভ হচ্ছিল ২৲ টাকা; এখন মজুরকে ২৲ টাকা দিয়ে লাভ থাকছে ৩৲ টাকা। মজুরী যেমন এক টাকা কমেছে, মালিকের লাভও তেমনি এক টাকা বেড়েছে।

মজুরকে আগের চেয়ে কম বদ্‌লী-মূল্য দেওয়া হচ্ছে; কিন্তু তার বদলে সে আগের চেয়ে ঢের বেশী বদ্‌লী-মূল্য তুলে দিচ্ছে মালিকের হাতে। মজুরীর বখরার চেয়ে পুঁজির বখরা বেড়ে গেছে। তার মানে, মজুরী আর পুঁজির মধ্যে সামাজিক ধনদৌলতের ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়েছে আরও অসমান। আগে যতটা পুঁজি দিয়ে যে পরিমাণে খাটুনির ওপর হুকুম খাটানো যেত, এখন ঠিক ততটা পুঁজি দিয়েই আগের চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণ খাটুনির ওপর হুকুম খাটানো যাচ্ছে। মজুর শ্রেণীর ওপর আরও বেড়ে গেছে মালিক শ্রেণীর দাপট। মজুরের সামাজিক মর্যাদা কমেছে, মালিকের তুলনায় তার স্থান আরেক কাঠি নীচে নেমে গেছে।

বাড়তি কমতি

মজুরী ও লাভ একটি আরেকটির তুলনায় কখনও বাড়ে কখনও কমে। এই বাড়া-কমা কোন্ নিয়মে হয়ে থাকে?

মজুরী ও লাভের মধ্যে সম্পর্কটা হল এই : একটি বাড়লে অন্যটি কমে, একটি কমলে অন্যটি বাড়ে। খাটুনির বখরা অর্থাৎ মজুরের মজুরী ঠিক যতটা কমবে, পুঁজির বখরা অর্থাৎ মালিকের লাভ ঠিক ততটা বাড়বে। তেমনি আবার পুঁজির বখরা অর্থাৎ মালিকের লাভ ঠিক যতটা কমবে, খাটুনির বখরা ঠিক ততটা বাড়বে। মজুরী যেমন যেমন কমবে, লাভও তেমন তেমন বাড়বে; লাভ যেমন যেমন কমবে, মজুরীও তেমন তেমন বাড়বে।

পুঁজি এবং মজুরীতে
চুলোচুলি ঝগড়া।
এ চাইছে ওর ভাগ কমিয়ে
বাড়ুক আমার বখরা॥

এর জবাবে হয়তো কেউ বলবে, "তা কেন? এক মালিক অন্য মালিকের সঙ্গে লেনদেন করার ভেতর দিয়েও তো দাঁও মারতে পারে। এমন হতে পারে যে, বাজারে তার মালটার চাহিদা বেড়ে গেছে, কিম্বা নতুন বাজার পাওয়া গেছে, কিম্বা পুরনো বাজারগুলোতেই চাহিদা সাময়িকভাবে বেড়ে গেছে—যার ফলে,

মালিকের লাভ হচ্ছে।" এরপর সে বলবে, "তাহলেই দেখুন, মজুরীর বাড়া-কমা, গতরের বদ্‌লী-মূল্য—এ সবের সঙ্গে কিছুমাত্র সম্বন্ধ না রেখেও স্রেফ অন্য মালিকদের ঘাড় ভেঙে একজন মালিকের লাভ বাড়তে পারে। আবার এমনও হতে পারে : যন্ত্রের উন্নতির দরুন, কিম্বা প্রকৃতির নতুন কোন শক্তিকে কাজে লাগানোর ফলে, কিম্বা আর কোন কারণে লাভের মাত্রা বেড়ে গেল। মালিকের লাভ বাড়ছে, কিন্তু মজুরের মজুরী কমছে কই ?"

লাভের পকেট

কমছে বৈকি। তবে এখানে মজুরী কমছে ব'লে লাভ বাড়ছে তা নয় বরং তার উল্টো—লাভ বাড়ছে ব'লে মজুরী কমছে। খাটুনির পরিমাণ সমান আছে, কিন্তু তার বদলে মালিক আরও অনেক বেশী বদ্‌লী-মূল্য পাচ্ছে—এই বেশীর জন্যে কোন বাড়তি মজুরী দিতে হচ্ছে না। মজুরের খাটুনি থেকে মালিকের যে নীট লাভ হচ্ছে, তার পাশে খাটুনির দামটা নেহাত ছোট। লাভের তুলনায় মজুরী ঢের কম। লাভ যেমন বেড়েছে, মজুরী তেমন কমেছে। একতলা বাড়ীর পাশে দশতলা বাড়ী উঠলে যেমন একতলা বাড়ীটা তুলনায় আরও ছোট হয়ে যায়, বাড়তি লাভের পাশে মজুরীর দশাও হয়েছে তেমনি।

এই সঙ্গে আগেকার আরও একটা কথা ঝালিয়ে নেওয়া যাক। বিভিন্ন পণ্যের দর ওঠা-নামা করলেও যেকোন পণ্যের দাম—

অন্য সব পণ্যের সঙ্গে তার লেনদেনের হার—যাচাই হয় উৎপাদনের খরচ দিয়ে। কাজেই মালিক শ্রেণীর মধ্যে এ-ওর ঘাড় ভাঙার ব্যাপারটা এমনভাবেই ঘটে থাকে, যাতে এর কম আর ওর বেশি একে অন্যকে সামাল দেয়। একজনের লাভের পকেট যতটা ভারি হয়, অন্যের লাভের পকেট ততটা হাল্কা হয়। ফলে, গোটা মালিক শ্রেণীর লাভের পকেট হরে দরে সমান থাকে।

একই খরচে

একসময় হয়তো দেখা গেল যন্ত্রের এমন উন্নতি হয়েছে, কিম্বা প্রকৃতির এমন এক নতুন শক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগানো গেছে, যাতে একই পরিমাণ খাটুনি আর পুঁজি দিয়ে ঢের বেশী পরিমাণ জিনিস তৈরি হতে পারছে। জিনিসের পরিমাণ বাড়ছে, কিন্তু তাই ব'লে বদ্‌লী-মূল্যের পরিমাণ বাড়ছে না। ধরা যাক, সুতো কাটার একটা নতুন যন্ত্র আবিষ্কার হল। পুরনো কলের জায়গায় আমি সেই নতুন কল বসালাম। এতদিন আমি যে কলে সুতো তৈরি করতাম, তাতে ঘণ্টায় পঞ্চাশ বাণ্ডিল সুতো হত। এখন আমি যে নতুন কলে সুতো তৈরি করছি, তাতে ঘণ্টায় একশো বাণ্ডিল সুতো হচ্ছে। যখন আমি একশো বাণ্ডিল সুতো নিয়ে বাজারে যাবো, তখন দেখব পঞ্চাশ বাণ্ডিল সুতোর বদলে যে পরিমাণ জিনিস এতদিন পেয়ে এসেছি, একশো বাণ্ডিল সুতো দিয়েও সেই একই পরিমাণ জিনিস পাচ্ছি। তার কারণ কী? কারণ এই যে, উৎপাদন যেমন দুগুণ হয়েছে, তেমনি

উৎপাদনের খরচও ক'মে অর্ধেক হয়েছে। একই খরচে এখন আমি দ্বিগুণ জিনিস যোগাতে পারি। কাজেই উৎপাদনের খরচ দিয়েই দর যাচাই হচ্ছে।

মোট লাভ বাড়ে

সরাসরি খাটুনি জুড়লে মোটের ওপর জমা খাটুনির পরিমাণ বেড়ে যায়। যেটুকু বাড়ছে, তাদের এক করলে পাওয়া যায় মালিকদের মোট নীট লাভ। কোন একটা দেশের কিম্বা গোটা দুনিয়ার মালিক শ্রেণী উৎপাদনের এই মোট লাভ নিজেদের মধ্যে ছোট বড় শরিকানায় ভাগ করে নেয়। সে যাই হোক, ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে : খাটুনি যেমন যেমন পুঁজিকে বাড়ায়, মালিকদের মোট লাভও তেমন তেমন বেড়ে যায়। অর্থাৎ মজুরীর তুলনায় লাভ যেমন যেমন বাড়ে, মালিক শ্রেণীর মোট লাভের অঙ্কও তেমন তেমন বেড়ে যায়।

খাটুনি যত বাড়ছে ততই
পুঁজির পোয়া বারো।
মজুরীকে ছাড়িয়ে লাভের
বহর বাড়ে আরো॥

বিপরীত স্বার্থ

পুঁজি আর মজুরীর যে সম্পর্ক, তার গণ্ডীর ভেতর দাঁড়ালে দেখা যাবে পুঁজির স্বার্থ আর মজুরীর স্বার্থ একটুও এক নয়। তাদের স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী।

পুঁজি যত তাড়াতাড়ি বেড়ে যাবে, মুনাফাও তার সঙ্গে

তালে তাল দিয়ে বাড়বে। মুনাফা বাড়তে পারে যদি খাটুনির দাম কমে অর্থাৎ, যদি আপেক্ষিক-মজুরী কমে। খাটুনির দাম যত তাড়াতাড়ি কমবে, তত তাড়াতাড়ি মুনাফা বাড়বে। নামমাত্র-মজুরী বা খাটুনির মুদ্রামূল্য বেড়ে গিয়ে সেইসঙ্গে আসল-মজুরীও বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু মুনাফার সঙ্গে সমান তালে আপেক্ষিক-মজুরী যদি না বাড়ে, তাহলে আসল মজুরী বাড়লেও আপেক্ষিক মজুরী কমে যেতে পারে।

একটা সময়ের কথা ধরা যাক, যখন ব্যবসার খুব তেজী অবস্থা। শতকরা পাঁচ টাকা হারে মজুরী বেড়ে গেল, অন্যদিকে মুনাফা বাড়ল শতকরা তিরিশ টাকা হারে। এক্ষেত্রে নামমাত্র-মজুরী বাড়লেও আপেক্ষিক-মজুরী এক ফোঁটা বাড়েনি ; বরং অনেক কমে গেছে।

পুঁজি যখন হুহু করে বেড়ে যাচ্ছে, তখন মজুরের রোজগারও বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে আবার মজুর আর মালিকের মধ্যেকার সামাজিক তফাতটা আরও প্রকাণ্ড হয়ে দেখা দেয়। মজুরীর ওপর পুঁজির ক্ষমতা আরও শক্ত হয়ে চেপে বসে। পুঁজির কাছে মজুরীর দাসত্ব আরও বেড়ে যায়।

চড়া মাশুল

পুঁজি তাড়াতাড়ি বেড়ে যাওয়ায় মজুরের স্বার্থ আছে —একথা একটি অর্থেই শুধু বলা যায়। তা এই যে, মজুর যতই পরের ধনদৌলত বাড়াতে পারবে, ততই তার বরাতে ক্ষুদকুঁড়োটুকু বেশী বেশী জুটবে। মজুরের সংখ্যা

যতই বাড়বে, পুঁজির কাছে বাঁধা ক্রীতদাসেরা ততই দলে ভারী হবে। তাহলে আমরা দেখতে পেলাম :

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পুঁজি বেড়ে গেলে অবশ্য মজুর শ্রেণীর খুবই সুবিধে হয়, বেশ খানিকটা বাঁচবার সুরাহা হয়—কিন্তু যত যাই হোক, তাতে মজুর আর মালিকের স্বার্থের হানাহানি বিন্দুমাত্র কমে না। মুনাফা আর মজুরী একই অবস্থায় থাকে। মুনাফা বাড়লে মজুরী কমে, মজুরী বাড়লে মুনাফা কমে।

পুঁজি তাড়াতাড়ি বাড়লে মজুরীও বাড়তে পারে ; কিন্তু মজুরী যত না বাড়ে, মুনাফা তার চেয়েও বহুগুণ তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়। সেকালের ডাকাতদের মত মুনাফা যেন রণ-পায়ে হাঁটে, মজুরের হাঁড়ির হাল ঘুচলেও তার জন্যে তাকে বড় রকমের মাশুল দিতে হয়—সামাজিক মর্যাদা হারাতে হয়। মালিকের সঙ্গে তার সামাজিক ব্যবধান আরও বেড়ে যায়। আকাশ-পাতাল তফাত হয়।

শেষ পর্যন্ত তাহ'লে দেখা গেল :

উৎপাদনের পুঁজি জল্‌দি জল্‌দি বাড়লে মজুরী খাটার পক্ষে ভারি সুবিধে হ'তে পারে। তার মানে? একটাই তার মানে। মজুরের দল যেমন দিন দিন ভারী হয়ে উঠবে, তার দুশমনের শক্তিও বাড়বে। যে ধনদৌলত মজুরের নিজের নয়, যা মজুরকে পদে পদে বেঁধে রাখে—সেই ধনদৌলতকেই সে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলবে। মজুর একটু সোয়াস্তির মধ্যে থেকে নতুন ক'রে খেটে মালিকের কড়ির পাহাড় তুলতে পারবে, পুঁজির দাপট বাড়াতে পারবে।

নামকাটা সেপাই

উৎপাদনের পুঁজি বাড়ার সঙ্গে মজুরী বাড়ার সম্পর্কটা একেবারে অবিচ্ছেদ্য—মালিক শ্রেণীর পোঁ-ধরা পণ্ডিতরা জোর গলায় একথা ব'লে থাকে। তারা এও বলে, পুঁজি যত ঘাড়ে-গর্দানে মোটা হবে, তার বান্দার বরাতে ততই ভাল খাওয়া জুটবে।

আগেকার দিনে রাজারাজড়াদের যারা তল্পি বইত, তাদের চেহারার চেকনাই ছিল। রাজবাড়ীর লোক-লস্করদের জাঁক-জমকে রাজার নামডাক খাতির বাড়ত। কিন্তু একালের কলওয়ালা মালিক শ্রেণীর কাছে সেকালের রাজারা হ'ল গেঁয়ো-ভূত। একালের মালিক শ্রেণী ঢের বেশী সেয়ানা, ঢের বেশী হিসেবী। হিসেবী না হয়ে তাদের উপায়ও নেই।

তাহ'লে ব্যাপারটা আরেকটু খুঁটিয়ে দেখা যাক :

উৎপাদনের পুঁজি বাড়লে মজুরীর কী দশা হয়?

̣ার পল্টন

পুঁজিবাদী সমাজের মোট উৎপাদনের পুঁজি বাড়লে আরও রকমারি খাটুনি এসে জমা হ'তে থাকে। পুঁজিগুলো সংখ্যায় ও বহরে বেড়ে যায়। পুঁজি যত বাড়ে মালিকে মালিকে পাল্লা দেওয়া ততই বাড়তে থাকে। পুঁজির বহর বেড়ে

যাওয়ায় বিরাট বিরাট হাতিয়ার নিয়ে শিল্পের ময়দানে এসে দাঁড়ায় খাটুনির দুর্ধর্ষ পল্টন।

শস্তায় যদি বেচতে পারে, তবেই এক মালিক অন্য মালিককে বাজার থেকে হটিয়ে দিয়ে তার পুঁজি বেহাত ক'রে নিতে পারে। নিজেকে না খুইয়ে যদি শস্তায় বেচতে হয়, তাহ'লে তার একটিমাত্র রাস্তাই খোলা আছে—উৎপাদনের খরচ কমানো, অর্থাৎ খাটুনির উৎপাদন করবার ক্ষমতা বাড়ানো। খাটুনির উৎপাদন করবার ক্ষমতা বাড়াতে গেলে সকলের আগে দরকার হাতে হাতে আরও বেশী কাজ ভাগ ক'রে দেওয়া, আরও বেশী শ্রম-বিভাগ; এবং সেই সঙ্গে দরকার যন্ত্রপাতির ব্যাপক ব্যবহার ও ক্রমাগত উন্নতি। যে কাজটা হাতের সাহায্যে হয়, সেটা কলের সাহায্যে করা। দিন দিন কলের উন্নতি করা। যারা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ ক'রে নেবে সেই খাটুনির পল্টন যত বড় হবে, যত বিরাট আকারে কল ব'সবে—উৎপাদনের খরচ তুলনায় ততই কমে যাবে, ততই খাটুনির ফলন বেড়ে যাবে। কাজেই মালিকরা এ-ওর সঙ্গে রেষারেষি ক'রে যন্ত্রপাতি বাড়ায়, আরও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা করে এবং এইভাবে যতটা পারে ফল উঠিয়ে নেয়।

আরো বেচ, জল্‌দি বেচ

ধরা যাক, এই সমস্ত ক'রে অন্য মালিকদের তুলনায় এক কাপড়-কলের মালিক কানাইয়ালাল মাংতারামের কাপড় তৈরির খরচ কমে গেল। আধ গজ কাপড় বুনতে অন্য

মালিকদের যে খাটুনির সময় যোগাতে হচ্ছে, সেই একই সময়ে কানাইয়ালালের কলে তার ডবল অর্থাৎ এক গজ কাপড় বোনা হতে লাগল। কানাইয়ালাল এর পর কী করছে না করছে দেখা যাক।

এতদিন কানাইয়ালাল যে দরে কাপড় বেচে আসছিল, সেই একই দরে এখনও সে কাপড় বেচতে পারে। কিন্তু কানাইয়ালাল দেখল, অন্য যেসব কাপড়ের কারবারী আছে তাদের যদি বাজার থেকে হটিয়ে দিতে হয়, নিজের বিক্রি যদি বাড়াতে হয় তাহ'লে দর ঠিক হুবহু আগের মত রাখা চলে না। কানাইয়ালাল এমন এক যন্ত্র এনেছে যার অসুরের মত কাজ করবার ক্ষমতা, এমনভাবে খুঁটিয়ে কাজ ভাগ হয়েছে যাতে মজুরদের কাছ থেকে একই সময়ে বেশী কাজ আদায় করা যায়—তার ফলে তার উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে। উৎপাদন যেমন যেমন বেড়েছে, তেমনি আবার বিক্রি করবার তাগিদটাও বেড়ে গেছে। কেননা এসব করতে গিয়ে কানাইয়ালালকে বহুৎ পয়সা ঢালতে হয়েছে। এখন যদি গাদা গাদা মাল জমে যায়, তাহ'লে তো তার সর্বনাশ! শস্তায় মাল বেচতে পারার জন্যেই তো সে এত কাণ্ড করেছে। উৎপাদনের উপায়টা তাই বেশী বেশী মাল তৈরি ক'রে উল্টে কানাইয়ালালকেই যেন চাবুক মারতে মারতে বলে, "আরও মাল বেচ, জল্‌দি বেচ। ওহে বাপু, মাল বেচতে চাও তো বাজার বাড়াও।" কাজেই কানাইয়ালালকে অন্যদের চেয়ে শস্তায় বাজারে মাল ছাড়তে হয়—আগের দর বজায় রাখা আর চলে না।

অন্য মালিকদের আধ গজ কাপড় বুনতে যা খরচ হচ্ছে, কানাইয়ালালের পুরো এক গজ কাপড় বুনতে সেই একই খরচ পড়ছে। তাই ব'লে অন্য মালিকরা যে দামে আধ গজ কাপড় বেচছে, কানাইয়ালাল সেই একই দামে কখনই পুরো এক গজ কাপড় বেচবে না। কেননা তা করতে গেলে শুধু-মাত্র উৎপাদনের খরচটুকু উঠে আসা ছাড়া বাড়তি আর কিছুই তার হাতে আসবে না। অন্যের চেয়ে পুঁজি বাড়িয়ে নয়, বরং আরও বেশী পুঁজি খাটিয়ে তার আরও বেশী আয় সম্ভব হতে পারে।

কানাইয়ালাল যা চায়, তা পাবার খুব সহজ উপায় আছে। উপায়টা হ'ল এই যে, যদি সে অন্য মালিকদের চেয়ে কাপড়ের দাম সামান্য কিছুটা কমিয়ে দেয় তাহ'লেই কানাইয়ালাল তার মতলব হাসিল করতে পারে। কম দরে বাজারে জিনিস ছেড়ে অন্যদের শুধু সে হটিয়ে দিতে পারবে তাই নয়, তাদের বিক্রির বাজারও সে অন্তত খানিকটা দখল করতে পারবে।

আমরা আগেই দেখেছি কোন পণ্যের বাজারদর কখনই তার উৎপাদনের খরচের সমান হয় না। বাজার যখন চড়া, উৎপাদনের খরচের চেয়ে পণ্যের বাজার-দর তখন বেশী হয়; বাজার যখন মন্দা, উৎপাদনের খরচের চেয়ে পণ্যটির বাজার-দর তখন কমে যায়।

আধ গজ কাপড় বুনতে অন্য মালিকদের যা খরচ পড়ছে তার চেয়ে কম দামে কানাইয়ালাল যদি আধ গজ কাপড় বেচে, তাহ'লে তার লোকসান নেই বরং লাভ আছে। কেননা নতুন কল বসিয়ে, খাটুনিকে আরও ভালভাবে কাজে লাগিয়ে কানাইয়ালাল উৎপাদনের খরচ অর্ধেক কমিয়ে ফেলেছে। কানাইয়ালালকে শুধু দেখতে হবে অন্যেরা আধ গজ কাপড় যে দামে বেচছে, সেই দামে পুরো এক গজ কাপড় যেন সে না বেচে। তাহ'লে হাতে তার বাড়তি কিছু থাকবে না।

পুঁজির কানে মন্তর

এদিকে কানাইয়ালালকে শস্তায় বাজারে মাল ছাড়তে দেখে অন্য মালিকরা তার কারসাজি ধ'রে ফেলল। কানাইয়া-লালকে তারা বেশী দিন সুখ ভোগ করতে দিল না। অন্য মালিকরাও একে একে নতুন কল কিনল, বেশী বেশী কাজ আদায়ের জন্যে খাটুনি আরও ভাগ ক'রে দিল। একই খরচে এখন ডবল উৎপাদন হ'তে লাগল। আগে আধ গজ কাপড় বুনতে যা খরচ পড়ত, এখন তার চেয়ে কম দামে সবাই বেচতে লাগল। শেষে এমন হয়ে দাঁড়াল যে, এখনকার উৎপাদনের খরচের চেয়েও কাপড়ের দাম পড়ে গেল।

তখন আবার এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উৎপাদনের নতুন উপায়ের পেছনে ছোটা। আরও কল চাই, কাজের আরও খুঁটিনাটি ভাগ চাই—তবে শস্তায় মাল ছেড়ে বাজার দখল করা যাবে।

বাজার দখল করতে গেলে
বেচতে হবে শস্তায়।
ছুটছে পুঁজি উৎপাদনের
নতুন নতুন রাস্তায়।

এমনিভাবে উৎপাদনের ধরনধারন, উৎপাদনের উপায়গুলোর ক্রমাগত ভোল বদলে যায়। আগে যেভাবে কাজের ভাগা-ভাগি হচ্ছিল, পরে সেই কাজের ভাগাভাগি আরও বেড়ে যায়; আগে যতটা কাজ যন্ত্রে হচ্ছিল, পরে যন্ত্রকে আরও বেশী বেশী কাজে লাগানো হয়; শিল্পের বহর আরও বড় হয়।

পুঁজিবাদী উৎপাদন পুরনো রাস্তা ছেড়ে বার বার নতুন রাস্তা নেয়; খাটুনির উৎপাদনের শক্তিগুলোকে না বাড়িয়ে পুঁজির আর উপায় থাকে না—কেননা পুঁজিই তাকে সেই শক্তি যুগিয়েছে। পুঁজির আর দম ফেলবার সময় থাকে না—কেবলি তার কানে মন্তর দেওয়া হয়: "আগে চলো, জল্‌দি চলো।"

নিয়মের শাসন

পুঁজিবাদী উৎপাদন যার শাসন মেনে চলছে, সেই নিয়মটা হ'ল এই: কারবারে দরের ওঠা-পড়া যখন যেমনই হোক, একটা গোটা পর্ব ধরলে দেখা যাবে—কোন একটি পণ্যের দাম নিশ্চয়ই তার উৎপাদনের খরচের সমান হয়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ঘাড় গুঁজে এই নিয়মেরই শাসন মেনে চলছে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের উপায় বাড়িয়ে কোন একজন মালিক পার পাচ্ছে না; অমনি তার দেখাদেখি অন্য মালিকরাও উৎপাদনের উপায় বাড়িয়ে ফেলে তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। উৎপাদন বেড়ে যাওয়ার ফল হচ্ছে এই যে, একই দামে আগের চেয়ে দশ, বিশ, কি একশো গুণ জিনিস তাকে যোগাতে হচ্ছে। জিনিসের দাম কমে যাচ্ছে; কাজেই এখন আগের চেয়ে হাজার গুণ বেশী জিনিস বেচতে পারলে তবেই সে তার লাভ ওঠাতে পারবে, উৎপাদনের বাড়তি খরচ পোষাতে পারবে। উৎপাদনের নতুন যন্ত্রপাতি কিনতে তাকে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়েছে। কাজেই তার কাছে এবং যারা তার সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে তাদের কাছেও—বেশী জিনিস বেচতে পারাটা জীবন-মরণের সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তখন আবার তাদের মধ্যে বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি প'ড়ে যাবে। প্রত্যেকে চাইবে নিজের জিনিস বেশী বেশী বেচতে। শস্তায় বাজারে মাল ছেড়ে অন্যদের হটিয়ে দেবার জন্যে তখন আবার দরকার হবে উৎপাদনের নতুন উপায়।

নিজের ফাঁদে বন্দী

উৎপাদন বাড়িয়ে পুঁজি যে একটু সুখে শান্তিতে উৎপাদনের ফল ভোগ করবে তার উপায় নেই। অমনি মালিকদের চোখটাটানি শুরু হয়ে যায়, শুরু হয় মালিকে মালিকে পাল্লা দেওয়া। পণ্যের দরকে ঠেলে উৎপাদনের খরচের কোঠায় নিয়ে যাওয়া হয়, তার জন্যে আবার উৎপাদনের

খরচ কমাতে হয়, একই দামে অনেক বেশী বেশী জিনিস দিতে হয়। উৎপাদনের খরচ যত কমে, সমান পরিমাণ খাটুনিতে উৎপাদন যত বেশী হয়—ততই আবার তাকে শস্তায় বাজারে মাল ছাড়তে হয়।

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে মালিক তো উৎপাদন বাড়াবার ব্যবস্থা করল। তারপর? তারপর সে মহাফাঁপরে পড়ছে। পুঁজি খাটিয়ে তা থেকে লাভ করতে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছে তাকে। খাটুনির সময় একই থাকবে, কিন্তু তাকে মালের যোগান দিতে হবে বেশী। প্রতিযোগিতার হাত থেকে তার রেহাই নেই; আর এই প্রতিযোগিতার নিয়মই হ'ল উৎপাদনের খরচের কোঠায় পণ্যের দরটাকে ঠেলে দেওয়া। অন্য মালিকদের কাবু করবার যে অস্ত্র সে ছোঁড়ে, সেই অস্ত্রে নিজেই সে কাবু হয়ে পড়ে।

নেশার ঝোঁকে

প্রতিযোগিতায় অন্যদের হটিয়ে দেবার জন্যে ক্রমাগত সে নতুন নতুন যন্ত্র ব্যবহার করে—যন্ত্রগুলো বেজায় দামী হ'লেও তাতে উৎপাদনের খরচ কমে; সেই সঙ্গে নতুন ক'রে কাজের ভাগাভাগি হয়। এ অবস্থা বেশীদিন চলে না; কিছুদিন যেতে না যেতেই প্রতিযোগিতার ঠেলায় উৎপাদনের সেই নতুন উপায়টাও পুরনো হয়ে যায়, অচল হয়ে যায়।

এটা কোন এক জায়গাকার ছবি নয়। গোটা দুনিয়ার বাজার জুড়ে এই হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড চলেছে। পুঁজি বাড়ছে, আর জমে উঠছে—পাঁচ জনের হাত থেকে একজনের হাতে

এসে জড়ো হচ্ছে, তারই ফলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেবল কাজের ভাগ হচ্ছে, হয় নতুন যন্ত্র আনা হচ্ছে নয় পুরনো যন্ত্রকে আরও নিখুঁত ক'রে তোলা হচ্ছে। কারবার আরও ফলাও হয়ে উঠছে। পুঁজি যেন দম দিয়ে নেশার ঝোঁকে টল্‌তে টল্‌তে এগিয়ে চলেছে।

কাজ ভাগাভাগি

উৎপাদনের পুঁজি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যাপারটাই ঘটে থাকে। এই রকমের কাণ্ডকারখানার মধ্যে মজুরীর কী দশা হয় ?

কাজ যতই খুঁটিয়ে ভাগ হয়, ততই একজন মজুর পাঁচ, দশ, এমনকি বিশজন মজুরের কাজ একা করতে পারে। কেমন ক'রে পারে ? পারে এইভাবে :

একজন লোক দিনে বারো ঘণ্টা খেটে বারো দিনে মোট যতটা কাজ করতে পারে, তার চেয়ে বেশী কাজ করতে পারে বারো জন লোক যদি আলাদা-আলাদাভাবে একদিন বারো ঘণ্টা খাটে ; কিন্তু সেই বারো জন লোক যদি এক সঙ্গে মিলে একদিন বারো ঘণ্টা কাজ করে তা'হলে তাদের মোট কাজ আরও বেশী হবে। তার মানে, মিলে মিশে কাজ করলে কাজ করবার ক্ষমতা বেড়ে যায়। মিলে মিশে কাজ করা মানেই হ'ল নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগাভাগি ক'রে নেওয়া। কলের মালিকরা মজুরদের মধ্যে এমনভাবে কাজ বিলি করে যাতে একটুও সময় নষ্ট না ক'রে তাদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব কাজ আদায় ক'রে নেওয়া যায়।

মজুরে মজুরে

মালিকরা সব সময়ে চেষ্টা করছে কিভাবে মজুরদের মধ্যে আরও খুঁটিয়ে কাজ ভাগ ক'রে একজনকে দিয়ে পাঁচ, দশ, বিশ জনের কাজ করিয়ে নেওয়া যায়—কিভাবে কাজের বোঝা আরও বেশী বেশী ক'রে একজনের ঘাড়ে চাপানো যায়।

এইভাবে একজনকে দিয়ে পাঁচ, দশ, বিশ জনের কাজ করানো মানেই হ'ল মজুরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পাঁচ, দশ, বিশ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া। মজুরদের এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে হয় শুধু শস্তায় গতর বেচে নয়, পাঁচ-দশ-বিশ জনের কাজ একজনে ক'রে। তাহ'লে দেখা যাচ্ছে, পুঁজির দল ক্রমাগত কাজ ভাগাভাগি ক'রে এইভাবে মজুরদের পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিতে বাধ্য করে।

পাঁচ-দশ-বিশ জনের কাজ
এক হাতে বরাদ্দ।
মজুররা তাই এ-ওর সঙ্গে
পাল্লা দিতে বাধ্য॥

অন্যদিকে আবার, যতই কাজের ভাগাভাগি হয়—ততই খাটুনি জিনিসটা সরল হয়ে আসে। মজুরের বিশেষ দক্ষতার কোন দাম থাকে না। মজুর হয়ে দাঁড়ায় উৎপাদনের এমন একটা শক্তি—যার নিজের কোন বাহাদুরি নেই। তার কাজটা নেহাত মামুলি, সাদাসিধে—নিতান্ত নীরস,

একঘেয়ে। দৈহিক কিম্বা মানসিক গুণপনার দরকার হয় না। যে কেউ সে-কাজ করতে পারে।

রবিদাস চর্মকার

ধরা যাক, আমাদের গাঁয়ের রবিদাস চর্মকার জাত-ব্যবসা খুইয়ে পেটের জ্বালায় শহরে এল কাজ খুঁজতে। বরাত জোরে এক বড় জুতোর কারখানায় তার কাজ জুটে গেল। গাঁয়ে যখন ছিল, তখন সে একাই একটা জুতো তৈরি করত। চামড়া মাপ করা, কাটা, সেলাই করা, পেরেক মারা, রং করা—সবই সে একা করত। ভাল কারিগর ব'লে গাঁয়ে তার নামডাকও ছিল। কিন্তু জুতোর কারখানায় পা দিয়ে সে অবাক হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখল কারখানার মধ্যে যেন হাট ব'সে গেছে। মজুররা পর পর দাঁড়িয়ে কাজ করছে—একজন শুধু একটা কাজই করছে। যে চামড়া কাটছে, সে শুধুই চামড়া কাটছে। তারপর সেটা যাচ্ছে পাশের লোকের হাতে। সে শুধুই সেলাই করছে।

তারা প্রত্যেকে একেকটা যেন দম-দেওয়া কলের মানুষ। যে যার শুধু নিজের কাজটুকু নিয়ে ব্যস্ত। পুরো জুতোটার ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। দেখে শুনে রবিদাস চর্মকার একটু দমেই গেল। তারপর তাকে নিয়ে গিয়ে জুতোয় সুখতলা আঁটার কাজ দেওয়া হ'ল। পাশে আরেকটি লোক দাঁড়িয়ে তাকে সুখতলা যুগিয়ে দিচ্ছিল—তার দিকে তাকাতেই রবিদাস তার গলায় পৈতে দেখতে পেল।

যে কেউ পারে

অবাক হয়ে যেই সে জিজ্ঞেস করতে যাবে, কী মশাই, "আপনি বামুনের ছেলে, না ? জুতোর কাজ করছেন যে ?"

অমনি সামনে থেকে হেঁড়ে গলায় কে একজন ধম্‌কে উঠল, "চটপট হাত চালাও।" রবিদাস পরে সেই পৈতেওয়ালা বামুনের ছেলের কাছ থেকে জানতে পারল, বিশ বছর ধ'রে সে নাকি ঐ এক কাজই ক'রে যাচ্ছে—জুতোর সুখতলা যুগিয়ে দেবার কাজ। রবিদাসকেও নাকি সারা জীবন ঐ এক কাজই ক'রে যেতে হবে—সুখতলা আঁটার কাজ।

রবিদাস বুঝল জুতোর কলে কাজ করার জন্যে মুচির ছেলে হয়ে জন্মাবার কোনই দরকার ছিল না। ছোটবেলা থেকে জুতো বানাবার কাজে হাত পাকানোরও কোন দরকার ছিল না। জুতোর সুখতলা আঁটার কাজ যদি সে করতে না চায়, তাহ'লে ঐ কাজের জন্যে লোকের কিছুমাত্র অভাব হবে না।

নিজের সঙ্গে লড়াই

খুঁটিনাটি কাজ ভাগ হবার ফলে, যে কোন কাজ যে কেউ করতে পারে। কাজ শিখতে কিছুই লাগে না। কাজ শেখার ব্যাপারটা যত সহজ হয়, ততই মজুরের গতর উৎপাদনের খরচ কমে সুতরাং মজুরী ততই কমে যায়। কোন পণ্যের উৎপাদনের খরচ কমলে যেমন তার দর প'ড়ে যায়—তেমনি গতর উৎপাদনের খরচ কমলে, খাটুনির দাম অর্থাৎ মজুরীও কমে যায়।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে: খাটুনি জিনিসটা যতই ঝক্‌মারির ব্যাপার হয়ে ওঠে, যতই তা বিরক্তিকর হয়ে ওঠে—ততই মজুরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বেড়ে যায় এবং মজুরীও ততই কমে যায়। মজুর তখন আরও বেশী খেটে তার মজুরীর পরিমাণটা বজায় রাখতে চেষ্টা করে। তার জন্যে হয় সে আরও বেশী সময় খাটে, নয়তো একই সময়ের মধ্যে আরও বেশী পরিমাণ কাজ তুলে দেয়। এইভাবে সে কাজ ভাগাভাগির কুফলটাকে অভাবের তাড়নায় আরও বাড়িয়ে তোলে। তার ফল হয় এই: সে যত বেশী কাজ করে, তত কম মজুরী পায়; তারই জন্যে তাকে অন্য মজুরদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হয়, অন্য মজুরদেরও আবার তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারই মত শস্তায় গতর বেচতে হয়। তাহ'লে দাঁড়ায় এই যে, মজুর শ্রেণীর একজন হিসেবে মজুরকে শেষ পর্যন্ত নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতায় নামতে হয়।

কাটাই ছাঁটাই

মালিকের কাজ ভাগাভাগির ফল ভুগতে হচ্ছে মজুরকে। তেমনি আবার মালিকের যন্ত্রগুলো মজুরকে কম যন্ত্রণা দিচ্ছে না—বরং তারা মজুরের দুর্গতি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে। তা কেমন ক'রে হয়? যন্ত্র তো মানুষের কাজ কমিয়ে দেয়। কাজ হাল্কা করে।

ভুলে গেলে চলবে না, যন্ত্র আছে মালিকের হাতে। যন্ত্র মালিকের কাজে লাগবে, মজুরের কাজে নয়। যন্ত্র আসছে মজুরের খাটুনি কমাতে নয়, যন্ত্র আসছে মালিকের উৎপাদনের

খরচ কমাতে। যন্ত্র এসে কাজগুলো সহজ ক'রে দিচ্ছে। সুতরাং ওস্তাদ মজুরের আর দরকার থাকছে না। সে জায়গায় আসছে আনাড়ি মজুর। পুরুষদের জায়গা নিচ্ছে মেয়েরা, সাবালকদের জায়গা নিচ্ছে নাবালকের দল। যেখানে সবেমাত্র কল এসে বসেছে, সেখানে কারিগরের দল জাত-ব্যবসা হারিয়ে পথে ব'সছে ; কেননা, কলে তৈরি জিনিসের সঙ্গে হাতে তৈরি জিনিস কখনই পাল্লা দিতে পারে না। যেখানে আগে থেকেই কল ছিল, যেখানে পুরনো কলের জায়গায় নতুন কল এসে ব'সছে, যেখানে কলের উন্নতি হচ্ছে—সেখানে দলকে-দল মজুর ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে। কেননা, কল এসে মানুষের জায়গা জুড়ে ব'সছে—মজুরের কাজ কেড়ে নিচ্ছে।
শিল্পের ময়দানে মালিকরা লড়াই করে। সেই লড়াইয়ে তারা খাটুনির পল্টনে ফৌজ ভর্তি করে যত না জেতে, তার চেয়ে বেশী জেতে পল্টন থেকে ফৌজ ছাঁটাই ক'রে। এই লড়াইয়ে মালিকরা হ'ল একেকজন জাঁদরেল সেনাপতি। শিল্পের ফৌজদের কে কত বেশী ছাঁটাই ক'রতে পারে, তাই নিয়ে সেনাপতিরা এ-ওর সঙ্গে পাল্লা দেয়।

অশ্বত্থামা হত

অর্থনীতির পণ্ডিতরা এসব শুনে মাথা নেড়ে ব'লবে "তা কেন? কল বসানোর ফলে মজুরদের কাজ চ'লে যাচ্ছে ঠিক। কিন্তু মজুররা তো নতুন নতুন কাজ পেয়ে যাচ্ছে।"
ওদের বলবার ঢংটা লক্ষ্য করবার মত। সোজাসুজি কিন্তু

একথা বলছে না যে, যাদের কাজ চলে যাচ্ছে তারাই আবার নতুন ক'রে কাজ পাচ্ছে। সে কথা বলবার মুখ নেই তাদের। কেননা বাস্তবে তা ঘটছে না সবাই জানে। তাই তারা মজুরদের যেন ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে এই ব'লে সান্ত্বনা দিতে চাইছে: "তা বাপু, তোমার কাজ গেছে তো হয়েছে কী? তোমার ছেলেপুলেয়া তো উঠে-যাওয়া কলটায় কাজ করবে ব'লে হাত ধুয়ে ব'সে ছিল। তাদের এবার নতুন কাজে লাগিয়ে দাও। তোমরা বুড়ো হাড়ে আর কতদিন সংসার টানবে? তার চেয়ে নও-জোয়ানদের কাজে লাগিয়ে বাকি জীবনটা ধম্মে-কম্মে মন দাও।"

পুঁজির পুজোয়

পুঁজির পুজোয় মালিকদের চাই তাজা তাজা রক্ত। চাই জোয়ান মদ্দ মানুষ। তাই বুড়োহাবড়াদের তারা আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেয়—লোকগুলো মরল কি বাঁচল তা দেখবার তাদের দরকার নেই। তারা জানে, ছেলেছোকরার অভাব হবে না। তু ব'লে ডাকলেই সব এসে যাবে। মালিকরা এও জানে, মজুরী-খাটার লোক না থাকলে তাদের পুঁজির দফা রফা হবে। মজুর শ্রেণীকে একেবারে বাদ দিয়ে সে জায়গায় কল বসাবার কথা তারা তাই ভাবতেই পারে না। ভাবতে গেলে তারা ভয়ে শিউরে ওঠে।

যদি ধ'রেও নেওয়া যায়, যারা ছাঁটাই হয়ে যাচ্ছে এবং যে নও-জোয়ানরা কাজ খুঁজছে, তাদের সকলেরই বরাতে নতুন কাজ জুটে গেল, যে মজুর কাজ খুইয়ে কাজ পাচ্ছে, সে

কি আগের মতই সমান হারে মজুরী পাবে? কিছুতেই তা পাবে না। কেননা, আমরা আগেই দেখেছি যখনই উৎপাদনের কায়দা বদ্‌লাচ্ছে, তখনই শক্ত কাজ সহজ কাজ হয়ে যাচ্ছে, উঁচুদরের কাজ নীচুদরের কাজ হয়ে যাচ্ছে! কাজেই মজুরীও সেই সঙ্গে না কমে পারে না। পুরনো কাজ খুইয়ে নতুন কাজ পাবার মানেই হ'ল কম মজুরীতে কাজ পাওয়া।

যন্ত্র দিয়ে যন্ত্র

মালিকদের পোঁ-ধরা অর্থনীতির পণ্ডিতরা এত কথা শোনবার পরও গোঁয়ারের মত তর্ক করতে ছাড়বে না। তারা ব'লবে "যন্ত্র তৈরির কারখানায় যে মজুররা কাজ করে, তাদের বেলায় তোমাদের কথা একেবারেই খাটে না। যতই নতুন নতুন যন্ত্র উৎপাদনের কাজে লাগবে, যন্ত্রের চাহিদা যতই বাড়বে—ততই বেশী বেশী যন্ত্রের দরকার হবে। যন্ত্রের দরকার পড়লে যন্ত্র তৈরির কারখানাও বেড়ে যাবে। যন্ত্র তৈরির কারখানা বাড়লে তার জন্যে নতুন নতুন মজুরেরও দরকার হবে। যেমন তেমন মজুর হ'লে তো আর যন্ত্র তৈরির কারখানা চলবে না—তার জন্যে কাজ-জানা চৌকশ মজুরের দরকার হবে। দরকার হবে শিক্ষিত মজুরের।"
১৮৪০ সালের আগে ব'ললে তবু তাদের কথাটার আধখানা মানা যেত। এখন আর কথাটার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্যি নেই। ১৮৪০ সালের পর থেকে যন্ত্র তৈরির কারখানাতে এমন এমন কল বসেছে, যেসব কল একাই একশো। ফলে,

শ'য়ে শ'য়ে মজুর কাজ খুইয়েছে। সেদিক থেকে যন্ত্র তৈরির কারখানাকে আজ আর অন্য সব কলকারখানা থেকে আলাদা করা যায় না। এখন আর সেখানে কাজ-জানা শিক্ষিত মজুরের দরকার নেই। গায়ের জোর, হাতের কৌশল বিদ্যেবুদ্ধি খাটাতে হয় না। জটিল যন্ত্রই সব কাজ ক'রে দেয়—যে কোন আনাড়ি লোক সে-যন্ত্র চালাতে পারে।

চারগুণ ক্ষয়

মালিকের পোঁ-ধরা পণ্ডিতের দল তবু নাছোড়বান্দার মত বলবে, "আচ্ছা বাপু, তোমাদের কথাই না হয় মেনে নিচ্ছি। কল বসানোর ফলে ধরলাম না হয় লোকটার জবাব হয়ে গেল। কিন্তু সে জায়গায় তিন তিনটে নাবালক ছেলেমেয়ে আর একটি স্ত্রীলোক তো কাজ পেতে পারে। তাহ'লেই তো লোকটার সমস্যা মিটে যায়। কাজ ক'রে যে মজুরী এতদিন সে পাচ্ছিল, তাই দিয়ে তার বউ আর তার তিনটি ছেলেমেয়ের পেট চালাতে হচ্ছিল। বংশ-রক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধির কথা ভেবেই মজুরের কমপক্ষে মজুরী কত হবে তা ঠিক করা হয়। বউ আর ছেলেমেয়ে কাজ পেয়ে গেলে তার আর কোন সমস্যাই তো থাকে না।"

এ থেকে কী প্রমাণ হয়? প্রমাণ হয় এই যে, একজন মজুরের পরিবার খেয়ে বাঁচবে ব'লে এখন তার চার গুণ মজুরের জীবন খুইয়ে ফেলা হচ্ছে। এতদিন একটা মানুষের জীবন নিংড়ে নেওয়া হচ্ছিল, এখন নিংড়ে নেওয়া হচ্ছে

চার জন মানুষের জীবন। একটি জীবনের জায়গায় তার চারগুণ জীবন বরবাদ হয়ে যাচ্ছে।

তাহ'লে গোটা ব্যাপারটা যা দাঁড়াচ্ছে, তা এই :

উৎপাদনের পুঁজি যতই বেড়ে যায়, কাজ ভাগাভাগি এবং যন্ত্রের ব্যবহার ততই বাড়ে। কাজ ভাগাভাগি এবং যন্ত্রের ব্যবহার যতই বেড়ে যায়, মজুরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ততই বাড়ে এবং সেই সঙ্গে মজুরীও ততই কমে।

খালি হাতের অরণ্য

মজুর শ্রেণী তার ওপর দলে ভারী হ'তে থাকে। সমাজের ওপরতলার একটা অংশ অবস্থার ফেরে মজুর হয়ে যায়। সামান্য পুঁজিপাটা নিয়ে যারা কারবার করে, যারা অল্প-স্বল্প টাকা সুদে খাটায়—তারা যথাসর্বস্ব খুইয়ে দলে দলে এসে মজুরদের মধ্যে ভিড়ে যায়। মজুরদের হাতের পাশে হাত বাড়িয়ে দিয়ে তারাও কাজ চায়। দিন দিন হাতগুলো শুকিয়ে কাঠির মত সরু হয়। কিন্তু দিন দিন সেই কাঠি-কাঠি হাতের অরণ্য আরও ঘন হয়ে ওঠে।

ক্ষুদে কারবারীরা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পেরে সর্বস্ব খুইয়ে মজুর হয়। প্রতিযোগিতার মানেই হ'ল পাল্লা দিয়ে উৎপাদন বাড়ানো, বড় কারবারী হওয়া। ক্ষুদে কারবারীরা তাই ক্ষুদে কারবারী হয়ে টিঁকে থাকতে পারে না।

পুঁজির যত প্রসার হয়, পরিমাণে ও সংখ্যায় পুঁজি যত বাড়ে—ততই পুঁজির ওপর সুদ কমে যায়। তখন ছোট-

খাটো সুদখোরদের পক্ষে শুধু সুদের টাকায় টিঁকে থাকা সম্ভব হয় না। কারবারে টাকা না খাটিয়ে তখন আর উপায় থাকে না। সুদখোর তখন বাধ্য হয়ে ক্ষুদে কারবারী হয়। তখন তার পক্ষে ক্ষুদে কারবারী হওয়া মানেই হ'ল শীগ্‌গির শীগ্‌গির মজুর শ্রেণীর দলে ভিড়ে যাওয়া।

চক্রাকারে সংকট

এতক্ষণ পুঁজিবাদী উৎপাদনের যে নিয়মটার কথা বলা হ'ল, পুঁজিপতি মালিক শ্রেণী সেই নিয়মের যাঁতাকলে বাঁধা। উৎপাদনের যে দৈত্যকায় যন্ত্রটাকে তারা খাড়া ক'রে তুলেছে তার ঘাড়ে তারা পর্বতপ্রমাণ কাজ চাপিয়ে দেয়। উৎপাদনের উপায়টাকে যত পারে খাটিয়ে নেবার জন্যে তারা বাকিতে কাজ কারবার করে। পুঁজিপতি মালিকরা পুঁজিবাদী উৎপাদনের এই নিয়ম না মেনে পারে না। যতই তারা এই নিয়মে চলে, ততই তাদের পায়ের নীচে থেকে বেশী বেশী ক'রে মাটি স'রে যায়—শিল্পজগতে ভূমিকম্প ততই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কারবারীর দল তাদের ধনদৌলতের একটা অংশ, তাদের তৈরি মাল এবং এমন কি উৎপাদনের যন্ত্র পর্যন্ত জলে ফেলে দিয়ে নৌকোডুবির হাত থেকে তখনকার মত নিজেদের বাঁচায়। এমনিভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থা পদে পদে সংকট ডেকে আনে।

জলের তলায় ধনদৌলত
নষ্ট হয় হোক্ গে।

ভরা ডুবির হাত থেকে পাই
তবুও যদি রক্ষে ॥

উৎপাদনের পরিমাণ যতই বাড়ে, ততই মালিকদের পক্ষে বিক্রির বাজার বাড়াবারও দরকার পড়ে। তার ফলে দুনিয়ার বাজার ক্রমেই ছোট হয়ে আসে। প্রত্যেকটি সংকটের সময় দেখা যায়, পুরনো বাজারগুলোর মধ্যে যেখানে যেটুকু সুযোগ ছিল তারা সেই সুযোগকে আগেই কাজে লাগিয়েছে। কাজেই বিক্রির বাজার এমনই ক'মে যায় যে, ঘন ঘন সংকট দেখা দেয়। আর এই সংকটগুলো ক্রমেই ভয়ানক হয়ে ওঠে।

যখন কবরে যায়

গতরের ওপর ভর ক'রে পুজি শুধু বেঁচে থাকে না। যখন সে কবরে যায়, তখন সে তার দাসদাসীদেরও সঙ্গে নিয়ে গিয়ে জ্যান্ত মাটিচাপা দেয়। সংকটের ধাক্কায় দলে দলে মজুর ফৌত হয়ে যায়।

চেহারার দিক থেকে হালফ্যাশানের হলেও পুঁজির ভেতরটা থেকে গেছে বর্বর যুগের রাজাদের মত—ম'রে গেলে যাদের জ্যান্ত দাসদাসীশুদ্ধ কবর দেওয়া হ'ত।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে : পুঁজি যতই বাড়ে, মজুরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা ততই বেড়ে যায়। তার ফলে, মজুর শ্রেণীর কাজ পাবার উপায়, বাঁচবার উপায় আরও ক্ষীণ হয়ে আসে। তা সত্ত্বেও কিন্তু মজুরী খাটার পক্ষে সব থেকে সুবিধে হয় যদি পুঁজি তাড়াতাড়ি বেড়ে যায়।

মূল্যের খোঁজে

ভোর হ'তে না হ'তে রাস্তায় বেরিয়েছি। আবার সেই মজুরের দলটার সঙ্গে দেখা। সন্ধ্যে বেলা যেদিক দিয়ে তারা ফিরছিল, দেখলাম সেই দিকে তারা হন্তদন্ত হয়ে ছুটছে।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপার কী? এত ভোর বেলায় কোথায় চললে সব?"

চলতে চলতে তারা জবাব দিল, "যাবো আর কোন্ চুলোয়? যাচ্ছি ভূতের বেগার খাটতে।"

ঠাট্টা নয়, সত্যি

ভূতের বেগারই বটে! অথচ কী আশ্চর্য! পুঁজির যে ভূতটা গতরের ঘাড় মট্‌কে যাচ্ছে, তাকে ভূত ব'লে চেনবার জো নেই।

শহরের বুকের ওপর শ্বেতপাথরের তৈরি তার বিরাট প্রাসাদ। চারপাশে কেয়ারি-করা ফুলের বাগান। দেউড়িতে বন্দুক-ধারী পাহারা। আইন-আদালত, পুলিস-পল্টন, কাগজ-কেতাব—সবই তার হাতের মুঠোয়। হাতে কড়ির মালা নিয়ে অষ্টপ্রহর সে রামনাম জপছে। সকাল-সন্ধ্যে, ঝকঝকে প্রকাণ্ড গাড়ীতে ক'রে যখন সে হাওয়া খেতে

বেরোয় তার ঘিদুধ-খাওয়া নাদুস্-নুদুস্ চেহারা দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। তখন যদি কেউ পাশ থেকে হঠাৎ ব'লে বসে, "কী হে, ভূত দেখছ বুঝি?" শুনে মনে হবে লোকটা নেহাত ঠাট্টা করছে। ঠাট্টা নয়, আসলে তার কথাটাই সত্যি।

মানুষের চামড়া দিয়ে পুঁজির ভূত এমনভাবে নিজেকে ঢেকে রাখে যে, তাকে চেনবার উপায় থাকে না। সমাজ তাকে মাথায় তুলে রাখে।

শুধু সে নিজেকেই ঢাকে না, তার গোটা দুনিয়াটাকেও সে ঢেকে রাখে। এমনভাবে সে মায়াজাল বিছিয়ে দেয়, যাতে তার কারসাজি কেউ ধরতে না পারে। তার এই মায়া-জালটা সরাতে পারলে হাতেনাতে তাকে ধ'রে ফেলা যায়। কলকারখানা খুলে আসলে যে কাণ্ডকারখানা সে চালাচ্ছে, তা জানতে পারা যায়।

মায়াজাল সরাতেই

মায়াজালটা সরাতেই দেখা গেল—

সারি সারি পশরা সাজানো। রকমারি সব জিনিস। তাদের একটাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে তুমি?" সে ব'লল, "আমি পণ্য।" জিজ্ঞেস করলাম, "পণ্য কী হে?" তার উত্তরে ব'লল, "আমি হলাম সেই জিনিস, যা মানুষের অভাব মেটায়—অন্য জিনিসের সঙ্গে আমাকে বদলে নেওয়া যায়। মানুষ যখন আমাকে বেচবার জন্যে তৈরি করে, তখনই আমি হই পণ্য।" আর সবাই দেখলাম ঘাড় নেড়ে তার

কথায় সায় দিচ্ছে। একটা হারমোনিয়াম হঠাৎ প্যাঁ-পোঁ, প্যাঁ-পোঁ ক'রে বেজে উঠল : অর্থাৎ কিনা—

মানুষ আমায় তৈরি ক'রে
মেটায় তার অভাব।
অন্য কিছুর সঙ্গে আমার
বদ্‌লে যাওয়া স্বভাব॥

আমি সেদিকে কান না দিয়ে আগের পণ্যটিকে জিজ্ঞেস করলাম, "তাহ'লে তোমরা মানুষের দরকারে লাগো। তার মানে—"আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে পাশ থেকে একটা দেয়াল-ঘড়ি টিক্ টিক্ ক'রে উঠল: "তার মানে আমরা হলাম ব্যবহার-মূল্য। এই যেমন ধরুন, আমি। মানুষকে আমি দিনরাত সময় ব'লে দিচ্ছি।"

আগের পণ্যটি বলতে লাগল, "একই ধরনের কিছুটা ব্যবহার-মূল্য অন্য ধরনের কিছুটা ব্যবহার-মূল্যের সঙ্গে যে-হারে বদল হয়, তাকে বলা হয় তুল্য-মূল্য বা বদলী-মূল্য। শুধু মূল্যও বলতে পারেন।"

একমনী চালের একটা বস্তা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে ব'লল, "যেমন আমাকে দিয়ে আপনি একটা গরম চাদর কিম্বা চার জোড়া জুতো কিম্বা নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্য কোন জিনিস পেতে পারেন। আমার বদলে এমন সব জিনিস পেতে পারবেন, যাদের কারো সঙ্গে কারো কোন বনিবনাই নেই—যেমন ধরুন, ঘোড়া কিম্বা লোহা কিম্বা বই।"

একতাল লোহা করুণ গলায় ব'লে উঠল, "দুঃখের কথা আর

বলেন কেন? মানুষ আমাকে এমন কি শোলার সঙ্গেও বদল করে।”

বহুরূপী খাটুনি

শুনে একটু ফাঁপরে প'ড়ে গেলাম। সত্যিই তো, এদের মধ্যে মিল কোন্‌খানে? একটির সঙ্গে আরেকটি বদল হচ্ছে কী হিসেবে?

একটি পণ্যকে ধ'রে জিজ্ঞেস করলাম, “বলো তো তুমি কিসের ফল?” সে জবাব দিল, “খাটুনির ফল।” তারপর যাকেই জিজ্ঞেস করলাম, সেই ব'লল সে খাটুনির ফল।

কয়লার বস্তাটা ন'ড়ে চ'ড়ে বলল, “বা রে, এ আবার ব'লে দিতে হয় নাকি? খাটুনি না হ'লে দুনিয়ার মুখই দেখতে পেতাম না। মাটির নীচে অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে প'ড়ে থাকতে হ'ত।”

এতক্ষণে ব্যাপারটার হদিশ পাওয়া গেল। যেটা সমস্ত পণ্যকে মেলাচ্ছে, সেটা হ'ল খাটুনি। প্রত্যেকটি পণ্যের পেছনে রয়েছে একেক রকমের খাটুনি। পণ্য বদলের ভেতর দিয়ে মানুষ রকমারি খাটুনি বদল করে।

একগাঁট কাপড় অমনি ব'লে উঠল, “আপনি তো আমাদের মধ্যে খাটুনির খুব মিল পেলেন! কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি কি—যে খাটুনি আমাকে তৈরি করেছে, সেই খাটুনিই কি ঐ বইটার মধ্যে আছে?”

বইটা এবার খশ্ খশ্ ক'রে ব'লে উঠল, “কক্ষনো নয়।

কাপড় তৈরি করেছে তাঁতী। আমাকে ছাপিয়ে বার করেছে ছাপাখানার মজুর। ছুটো ছু রকমের খাটুনি।"

ভাল মুশকিলেই পড়া গেল। একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, হলফ ক'রে বলো তো, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যার পেছনে মানুষের খাটুনি নেই ?" সবাই চুপ। তখন জিজ্ঞেস করলাম, "তাহ'লে তোমরা সবাই মানুষের খাটুনি দিয়ে তৈরি ?" এবার সবাই একবাক্যে ব'লে উঠল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

খাটুনি তাহ'লে ছু রকমের দাঁড়াচ্ছে ; একটা হ'ল বিশেষ বা ব্যক্তিগত খাটুনি, অন্যটা হ'ল নির্বিশেষ বা সামাজিক খাটুনি। তাঁতী হিসেবে, খনির মজুর হিসেবে, ছাপাখানার মজুর হিসেবে যে খাটুনি সেটা বিশেষ বা ব্যক্তিগত খাটুনি ; মানুষ হিসেবে যে খাটুনি, সেটা হ'ল নির্বিশেষ বা সামাজিক খাটুনি।

তাহ'লে পণ্যের মূল্য যাচাই হচ্ছে সামাজিক খাটুনির সময় দিয়ে।

পিপুফিশুর দল

এ কথা শুনে পি-পু-ফি-শুর দল বোধ হয় খুব খুশি হচ্ছে। কেননা যেটা এক ঘণ্টায় হয়, সেটা করতে তারা দশ ঘণ্টা লাগিয়ে দেয়। সুতরাং তারা ভাবছে তাদের তৈরি জিনিস সোনার দরে বিকোবে। কিন্তু তাদের খুশি হবার কোন কারণ নেই। কোন একটা সমাজে উৎপাদনের জন্যে যে খাটুনির সময়টা দরকার হয়, সেই দরকারী

সময়টাই হবে মূল্য যাচাইয়ের মাপকাঠি। উৎপাদনের নতুন উপায় বার হ'লে সমাজের পক্ষে দরকারী খাটুনির সময়টাও ক'মে যায়। পি-পুঁ-ফি-শুর দল যেহেতু কোন একটা জিনিস তৈরি করতে দরকারের চেয়ে বেশী সময় লাগিয়ে দেয়, সেইজন্যে তাদের পণ্যের মূল্য কোনমতেই বেশী হ'তে পারে না।

হঠাৎ একটা গ্রামোফোনের রেকর্ড বেজে উঠল। কান পেতে শুনলাম গান হচ্ছে—

এতক্ষণে দাদার আমার
বুদ্ধিটুকু খুলল।
গতরখাটার সময় দিয়ে
বার করলেন মূল্য ॥

এমন সময় গড়াতে গড়াতে একদল টাকাকড়ি এসে হাজির হ'ল। তাদের বেজায় দেমাক। বাজখাঁই গলায় তারা ব'লল, "কী, আমাদের কথা বলা হচ্ছিল বুঝি? আমরাই তো জিনিসের বদলে জিনিস মিলিয়ে দিই। আমরা হ'লাম মূল্যের মাপ। আমাদের তোমরা মূল্যের মা-বাপও ব'লতে পারো। আমরা না থাকলে মূল্য মনে মনেই থাকত। তাকে আর দেহ পেতে হ'ত না। আমরা হলাম টাকাকড়ি। আমাদের অন্য নাম মুদ্রা—অর্থাৎ, আমরা ব'লে দিই, প্রকাশ করি।"

খোলস বদলানো

দূরে হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে আলাদা হয়ে বসেছিল একটা বুড়ো বেঁটেখাটো পাহাড়। সে এবার মুখ খুলল,

"আমার বয়েসের গাছপাথর নেই, বাপু। মানুষ যখন বনেজঙ্গলে থাকত, তখন থেকে আমি মানুষদের দেখে আসছি। তারপর মানুষের সমাজ কতই না বদ্‌লেছে।"
টাকাকড়ির দিকে ফিরে তারপর ব'লতে লাগল, "তোমরা তো সেদিনকার ছেলে, হে। মানুষ যখন সোজাসুজি জিনিসের বদলে জিনিস নিত, তখন তোমরা ছিলে কোথায়, চাঁদ? আগে দেখেছি, মানুষের যখন ক্বচিৎ কদাচিৎ দরকার পড়ত, তখনই সে জিনিসের বদলে জিনিস নিত। হয়তো একটা চামড়া দিয়ে দুটো বর্শা পেত। সোজাসুজি ব্যবহারের ভেতর দিয়েই তখন মূল্য টের পাওয়া যেত।"
একটু থেমে আবার সে রাশভারি গলায় শুরু করল: "তারপর মানুষের জিনিস লেনদেনের দরকার আরও বেড়ে গেল। একটা জিনিসের সঙ্গে শুধু এক রকমের জিনিসই নয়, পাঁচ রকমের জিনিস বদল হ'তে লাগল। হয়তো একটা চামড়ার বদলে দুটো বর্শা কিম্বা একজোড়া জুতো কিম্বা একখানা কাপড় কিম্বা এক বস্তা চাল কিম্বা আর কিছু পাওয়া যেতে লাগল। ফলে, মূল্যের চেহারা বদ্‌লে গেল। লেনদেন বেড়ে যেতে মূল্যেরও আবার রকমফের হল। এতদিন একটি বলদের বদলে একটি নৌকো কিম্বা তিন জোড়া জুতো কিম্বা তিন বস্তা চাল কিম্বা আর কিছু পাওয়া যাচ্ছিল; এবার দেখা গেল, যে-কোন জিনিস দিয়ে বলদ পাওয়া যাচ্ছে। বদল দিয়ে যে-কোন জিনিসের মূল্য হিসেব হচ্ছে। একটি জিনিস দিয়ে হিসেব হচ্ছে অন্য যাবতীয় জিনিসের মূল্য। পরে এই বলদের জায়গাতেই উড়ে এসে

জুড়ে বসেছে টাকাকড়ি। ছিল বলদ, হয়েছে টাকাকড়ি —মূল্য শুধু খোলস বদলেছে। তোমাদের তো বাপু পরের ধনে যত পোদ্দারি। তা অত গুমর কিসের? দিন আসছে, যখন লোকে তোমাদের আর পুঁছবেও না। তখন তোমরা যাদুঘরে চোখ উল্টে পড়ে থাকবে। মূল্য তখন তোমাদের ছেড়ে যাবে।"

টান দিলে পাই

বুড়োর কথা থেকে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। মূল্য বলতে যা বোঝায়, আসলে তা জিনিসে জিনিসে সম্পর্ক নয়। জিনিস যারা তৈরি করছে, যারা লেনদেন করছে, তাদের মধ্যেকার সামাজিক সম্পর্ক—মানুষে মানুষে সম্পর্ক। পণ্যের সঙ্গে পণ্যের বদল হচ্ছে—পণ্যের সঙ্গে পণ্যের এই সম্বন্ধটাই শুধু আমাদের চোখে পড়ছে। যারা হাত বদল করছে, যারা উৎপাদন করছে তাদের সম্পর্কটা চোখের আড়াল করে রাখা হয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের উৎপাদনের সম্পর্কটা সোনাচাঁদির চাদরে মুখ ঢেকে আছে। পণ্যের মূল্য যাচাই করতে গিয়ে সটান মানুষের খাটুনি এসে হাজির হল। পণ্যের সঙ্গে পণ্যের সম্বন্ধ খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেল মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক।

এতদিনে ধরে ফেললাম
পুঁজিবাদীর চালটা।
বোকা লোককে দুনিয়াটা সে
দেখায় উল্টোপাল্টা॥

হরেক রকম জিনিস দিয়ে
চোখে লাগায় ধন্ধ।
মূল্য ধরে টান দিলে পাই
মানুষের সম্বন্ধ॥

বলতে বলতে বেরিয়ে আসছি, শুনতে পেলাম টাকাকড়ি ফোঁস ফোঁস করে গজরাচ্ছে। তার এতদিনকার জারিজুরি ভেঙে গিয়ে আসল মূল্য বেরিয়ে পড়েছে ব'লে রাগে তার ল্যাজ ফুলে উঠেছে। পাছে বিষদাঁত বসিয়ে দেয়, তাই তাড়াতাড়ি আমি সেখান থেকে দে-ছুট দে-ছুট।

পকেটমার ! পকেটমার !

এবার তাহলে মানুষের রাজ্যে ফিরে আসা যাক।

মানুষ যখন বাজারে বেচবার জন্যে জিনিস তৈরি করতে লাগল, তখন জিনিস দিয়ে জিনিস নিত। লেনদেন যখন রীতিমত বেড়ে গেল, যখন একসঙ্গে অনেক জিনিসের সঙ্গে অনেক জিনিসের হাত বদল হতে লাগল, তখন খুব মুশকিল দেখা গেল। টাকাকড়ি বা মুদ্রা এসে মানুষকে তখন অনেক ঝামেলার হাত থেকে বাঁচাল। পণ্যের সঙ্গে পণ্যের লেন-দেনে মুদ্রা হল মধ্যস্থ। পণ্য আসল, মুদ্রা উপলক্ষ।

সেই সময় যারা সওদাগরি আর বোম্বেটেগিরি করে বড়লোক হয়েছিল, তারা তাদের সম্পত্তি সোনাদানায় জমিয়ে রেখে-ছিল। এই জমানো সোনাদানা, জমানো টাকাকড়ি পুঁজি হিসেবে গড়ে ওঠে।

টাকা দিয়ে টাকা

পুঁজি হবার পর বেচা-কেনার ধারাটা উল্টে গেল। আগে ছিল কেনার জন্যে বেচা। এখন থেকে হল বেচার জন্যে কেনা। টাকা দিয়ে টাকা আসতে লাগল। টাকার সঙ্গে টাকার লেনদেনে পণ্য হল মধ্যস্থ। টাকা আসল, পণ্য উপলক্ষ। যে টাকাটা হাত থেকে যাচ্ছে, তার চেয়ে যে

টাকাটা হাতে আসছে সেটা কিন্তু বেশী হতে হবে। টাকাকে হাতছাড়া করবার আগে পই-পই করে বলে দেওয়া হচ্ছে, "যাচ্ছো একা, কিন্তু সঙ্গে জুটিয়ে নিয়ে ফেরা চাই।"
টাকাটা খেটে যখন মালিকের হাতে ফিরে আসে, তখন দেখা যায় টাকা বেড়ে গেছে। আগে তার যা মূল্য ছিল, খেটে আসার পর দেখা গেল তার মূল্য বেড়ে গেছে। যেটুকু বেড়ে গেল, সেটাই হল বাড়তি মূল্য।

একটি টাকা খাটতে গেল
ফিরল হয়ে আরো।
কেউ আছ কি এই হেঁয়ালির
জবাব দিতে পারো?

বোঝা মুশকিল

পণ্যের সঙ্গে পণ্যের যে লেনদেন, সেই লেনদেনের ভেতর দিয়েই কি এই বাড়তি মূল্যটা আসছে?
তা কেমন ক'রে হবে? সেখানে তো সমানে সমানে, সমান মূল্যের সঙ্গে সমান মূল্যের লেনদেন হচ্ছে। বাড়তি মূল্য এসে যাওয়ার কোন উপায় নেই।
তাহ'লে কি জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিয়ে খদ্দেরের পকেট মেরে এই বাড়তি মূল্যটা মালিকের ঘরে আসছে?
তাই বা কেমন ক'রে হবে? বেচা আর কেনার ভেতর দিয়ে এর লাভ আর ওর ক্ষতি কাটাকাটি হয়ে যায়। কাজেই জিনিসের বাড়তি দাম থেকে বাড়তি মূল্য কিছুতেই আসতে পারে না। তাছাড়া, টাকা বেড়ে যাওয়ার

এই ঘটনাটা তো শুধু দুচারজনের বেলাতেই ঘটছে না— সমাজে সাধারণভাবেই ঘটছে। ব্যাপকভাবে ঘটছে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে : মালিকরা যে লাভ পকেটে পুরছে, সেটা নিজেদের মধ্যে এ-ওর পকেট মেরে নয়। পুঁজি বেড়ে যাওয়ার মানে এ নয় যে, এ-মালিকের টাকা ও-মালিকের পকেটে যাচ্ছে।

বড় মুশকিলেই তো পড়া গেল দেখছি। তাহ'লে বাড়তি মূল্যটা আসছে কোথা থেকে ? আকাশ থেকে তো পড়তে পারে না।

টাকা তো হাঁস-মুরগী নয় যে বসিয়ে রাখলে টাকায় ডিম পাড়বে। টাকা বাড়াতে গেলে টাকা খাটাতে হবে, এমন জিনিসে টাকা খাটাতে হবে, যে জিনিস ব্যবহার করলে বাড়তি মূল্য দেবে।

বেচনলাল পোদ্দার

ঘরে ব'সে ভেবে ভেবে সে-জিনিসের হদিশ পাওয়া শক্ত। বোঝাই যাচ্ছে জিনিসটা যেমন তেমন নয়। তার চেয়ে একবার দেখে আসা যাক বড়বাজারের তেলকলওয়ালা বেচনলাল পোদ্দার কিভাবে তার কারবার চালাচ্ছে।

দেখা গেল, বেচনলাল এই এই জিনিসে তার টাকা খাটিয়েছে : যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, জ্বালানি এবং সেই সঙ্গে মজুরী। এই ভাবে টাকা খাটানোর ফলেই তার কারখানায় উৎপাদন হ'তে পেরেছে। জ্বালানি পুড়েছে, যন্ত্রপাতি চলেছে, মজুররা খেটেছে, কাঁচা মাল পণ্যের আকার নিয়েছে। সেই পণ্য বিক্রি ক'রে উৎপাদনের কাজ চালু রাখা হবে।

এইভাবে যে পণ্য তৈরি হ'ল, তার মূল্য কিভাবে যাচাই হবে? মূল্য যাচাই হয় খাটুনির সময় দিয়ে। পণ্য তৈরি করতে কাঁচামাল লেগেছে, জ্বালানি পুড়েছে, যন্ত্রপাতি ক্ষয় হয়েছে। এই যে জিনিসগুলো খরচ হয়েছে খাটুনির সময় হিসেবে তার মূল্য ধরলে হয় ৩ হাজার ঘণ্টা খাটুনি।

এগুলো সব পুরনো খাটুনি, পুরনো মূল্য। এর সঙ্গে নতুন খাটুনি, নতুন মূল্য যোগ হয়েছে,—বেচনলালের কলে যে মজুররা খেটেছে তাদের খাটুনি। ২০ জন মজুর দিনে ৮ ঘণ্টা হিসেবে ৫ দিন খেটে ঐ পণ্য তৈরি করেছে। অর্থাৎ তারা মোট ৮ শো ঘণ্টা খেটেছে।

তাহ'লে বেচনলাল যে পণ্য পাচ্ছে তার মোট মূল্য হ'ল: ৩ হাজার ও ৮ শো অর্থাৎ মোট ৩ হাজার ৮ শো ঘণ্টা খাটুনি।

বেচনলাল পাচ্ছে ৩ হাজার ৮ শো ঘণ্টা খাটুনির মূল্য। কিন্তু তার খরচ পড়ছে কত?

জ্বালানি, যন্ত্রপাতি আর কাঁচামাল বাবদ ৩ হাজার ঘণ্টা। খাটুনির মূল্য তাকে কড়ায়-গণ্ডায় মিটিয়ে দিতে হয়েছে। এ ছাড়াও বেচনলাল তার পণ্যের মধ্যে একটা নতুন মূল্য পেয়েছে—৮ শো ঘণ্টা খাটুনি। এই নতুন মূল্যটি পাওয়া গেছে মজুরদের কাছ থেকে।

তার মানে

বেচনলালকে সবিনয়ে বললাম, "পোদ্দার জী, একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

"জরুর।"

"আচ্ছা, আপনি কি মজুরদের খাটুনির মূল্য পুরোপুরি মিটিয়ে দিয়েছেন?"

"জরুর।"

"কেমন ক'রে দিয়েছেন, একটু ভেঙে ব'লবেন?"

বেচনলাল এবার আমাকে একদম বেকুব ভাবল। ব'লল, "কেন? ওরা বিশ জন পাঁচদিন খেটেছে—সেই বাবদ ওদের গতরের মূল্য আমি পুরো চুকিয়ে দিয়েছি। যাতে ওরা পাঁচ দিন গতর বজায় রেখে খাটতে পারে, সেইমত মজুরীই ওদের আমি দিয়েছি।"

আমি ব'ললাম "গতর বজায় রাখতে গেলে আজকের সমাজে একজন মজুরকে ধরুন দিনে ৪ ঘণ্টা খাটলেই চলে। তাহ'লে মজুরের ৫ দিনের গতরের মূল্য দাঁড়ায় ৪০০ ঘণ্টা খাটুনি। ওরা আপনাকে দিচ্ছে ৮০০ ঘণ্টা খাটুনির মূল্য; তার বদলে পাচ্ছে ৪০০ ঘণ্টা খাটুনির মূল্য। তার মানে—"

আমি বলতে যাচ্ছিলাম: তার মানে, মোট ৩ হাজার ৪ শো ঘণ্টা খাটুনির মূল্য খরচ ক'রে বেচনলাল পাচ্ছে মোট ৩ হাজার ৮ শো ঘণ্টা খাটুনির মূল্য। তার লাভ হ'চ্ছে ৪ শো ঘণ্টা খাটুনির মূল্য।

বেচনলালের দিকে চোখ পড়তেই আমার মুখের কথা মুখেই থেকে গেল। দেখলাম তার ভাঁটার মত চোখ দুটো ঘুরছে। আমার দিকে ভাল্লুকের মত তেড়ে আসছিল, কিন্তু টেবিলে তার ভুঁড়ি আটকে যাওয়ায় আমি সেই সুযোগে এক লাফে

বাইরে এসে পড়লাম। কানে এল বেচনলাল চেঁচাচ্ছে, "বেআদপ কাঁহাকার, আমাকে চোর ব'লতে চাস?"

হাত সাফাই

বেচনলালের কাছে, প্রথমে ছিলাম বেকুব, পরে হলাম বেআদপ। স্পষ্ট বোঝা গেল, বেচনলাল আর তার মালিক জাত-ভাইরা মজুরদের গতরের মূল্য চুরি ক'রে কড়ির পাহাড় তুলছে। এই চুরিটা তারা ঢেকে রেখেছে। কিছুতেই মজুরদের জানতে দিতে চায় না।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে: পুঁজি খাটিয়ে পুঁজি বাড়ানোর ব্যাপারটা আসলে হচ্ছে মজুরদের ঘাড় ভেঙে। বাড়তি মূল্যটা তৈরি করছে মজুরের গতর। মজুরের এই সোনা-ফলানো গতরটাকেই মালিক টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছে। মজুরকে সে যা দিচ্ছে, মজুরের গতরটাকে কাজে লাগিয়ে মালিক তার চেয়েও বেশী উশুল ক'রে নিচ্ছে। মজুর বাড়তি খেটে বাড়তি মূল্য মালিকের হাতে তুলে দিচ্ছে। মালিক মজুরকে যত বেশী বাড়তি খাটাতে পারবে তত বেশী বাড়তি মূল্য পাবে। পুঁজি তত বেশী ফুলে ফেঁপে উঠবে।

এতক্ষণে হেঁয়ালিটার জবাব পাওয়া গেল:

গতর কিনে তার বদলে
টাকা দিলাম ছেড়ে।
ফিরে এলে দেখি টাকার
বহর গেছে বেড়ে॥

এমনি ক'রেই পুঁজির ভূত এতদিন মহানন্দে মানুষের গতরের ঘাড় মট্‌কে খাচ্ছিল।

পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি

গেটে বসে দরোয়ান ঘাড় গুঁজে খৈনি. টিপছিল। সেই ফাঁকে ঢুকে পড়লাম এক কাপড়ের কলে। কেমন করে কাপড় তৈরি হয় দেখতে।

ভেতরে ঢুকে দেখি ভোঁ-ভাঁ। কেউ কোথাও নেই। মনে হ'ল যেন এক ঘুমন্ত পুরীতে এসে পড়েছি। দেয়ালে ঠেস্ দিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে আছে বস্তাবন্দী শাদা শাদা তুলো। কাপড়ের কলটা ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছে। দেখে শুনে বুঝলাম ভুল করে ছুটির দিনে এসে পড়েছি। মজুররা কাজে আসেনি আজ। মজুর না এলে কল চলবে কেমন করে? তুলোর তো ঠ্যাং নেই যে, গুটি গুটি এসে সুড়ুত করে কলের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে। কলের তো হাত নেই যে তুলোর কান পাকড়ে হিড় হিড় করে টেনে আনবে। কলের নিজের চলবার মুরোদ নেই। চালালে তবেই সে চলে।

মজুরের জীয়নকাঠি

তাকিয়ে দেখলাম ময়দানবের মত অত বড় কলটা মড়ার মত পড়ে আছে। গায়ে হাত দিলাম। ঠাণ্ডা হিম। জীয়ন-কাঠির ছোঁয়া পেলে তবেই সে বেঁচে উঠবে।

মানুষের হাতেই সে জীয়নকাঠি। মানুষ হাত লাগালে

তবেই মরা জিনিসগুলো প্রাণ পায়। কল চলতে আরম্ভ করে। কারখানা সরগরম হয়।

উৎপাদনের মালমশলাগুলো সবই আগেকার তৈরি জিনিস। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল—সমস্তই আগেকার খাটুনি দিয়ে তৈরি। খাটুনি ফুরিয়ে গেছে। কাজেই তার আর বাড়বৃদ্ধি নেই। যে খাটুনি দিয়ে তারা তৈরি, সেই খাটুনিটা হাতের বাইরে চলে গেছে। তাকে আর টেনে বাড়ানো চলবে না। খাটুনিটাই হল মূল্য। কাজেই সেই মালমশলাগুলোর মূল্যের কোন হেরফের হয় না।

কল, তুলো আর যা কিছু মালমশলা দিয়ে কাপড় তৈরি হয়—সব কিছুর মধ্যেই পড়ে আছে আগেকার খাটুনি। কাপড় যখন তৈরি হয়, তখন মজুররা হাত লাগিয়ে আস্ত সেই খাটুনিটাকে কাপড়ের মধ্যে চালিয়ে দেয়। তার মূল্যের কোন নড়চড়হয় না। একই মূল্য যেন পুরনো খোলস বদ্‌লে নতুন খোলস নেয়। মালমশলাই হল উৎপাদনের উপায়। এই উৎপাদনের উপায়ের পেছনে, বাঁধা মূল্যের পেছনে যে পুঁজিটা খরচ হয় সেটা বাঁধা পুঁজি। বাঁধা পুজির কোন নড়চড় হয় না।

মালিকের সিঁদকাঠি

শুধু উৎপাদনের উপায় থাকলেই চলে না। উপায়টাকে কাজে লাগানো দরকার। মজুর না হ'লে উৎপাদনের অবস্থাটা দাঁড়ায় শিবহীন যজ্ঞের মত। উৎপাদনের সমস্ত আয়োজন পণ্ড হয়ে যায়। মজুরী দিয়ে তাই মালিককে

মজুরের গতর কিনতে হয়। মজুরের গতর তার নিজের মূল্য ছাড়াও কাজ ক'রে আরও বাড়তি মূল্য যুগিয়ে দেয়। মজুর যা পায় তার চেয়ে বেশী মূল্য মালিককে ফিরিয়ে দেয়। মজুরী দিয়ে মালিক যে মূল্যটা পায়, সেটা বরাবর এক থাকে না— বেড়ে যায়, বদ্‌লায়। পুঁজির যে অংশটা দিয়ে চালু খাটুনিকে কেনা হয়, সেই অংশটাকে বলে চালু পুঁজি।

বাঁধা পুঁজির সঙ্গে চালু পুঁজিটাকে খতিয়ে দেখলেই মালিকের লাভের বহর জানতে পারা যায়। মজুরের হাতে থাকে খাটুনির জীয়নকাঠি আর মালিকের হাতে থাকে খাটুনি চুরি করার সিঁদকাঠি।

কলে কৌশলে

মজুরের গতর শুষে বাড়তি মূল্য টেনে বাড়াবার দুটো কায়দা আছে। কাজের ঘণ্টা বাড়িয়ে এবং দরকারী খাটুনির সময় কমিয়ে। কাজের ঘণ্টা বাড়াতে গেলে জোরজুলুমের দরকার হয়। দরকারী খাটুনির সময় কমাতে গেলে কলকৌশলের দরকার হয়। জোরজুলুম করে কাজের ঘণ্টা বাড়ানোর দিন চলে গেছে। মালিক তাই কলেকৌশলে বাড়তি মূল্য বেশী করে আদায় করে। হাতে হাতে কাজ ভাগ ক'রে কাজের মাত্রা বাড়িয়ে, বড় বড় কল বসিয়ে অন্যদের চেয়ে কম সময়ে মাল তৈরি করে।

এইভাবে মজুরদের ঘাড় ভেঙে যে বাড়তি মূল্যটা আদায় হয়, তার একটা ভাগ মালিক জমায়—নিজের ভোগে লাগাবার জন্যে নয়, নতুন উৎপাদনের কাজে লাগাবে বলে। এই জমানো পুঁজির সবটাই চালু পুঁজি হিসেবে খাটে না; সবটাই

মজুরী বাবদ খরচ হয় না। পুঁজির একটা অংশ উৎপাদনের মালমশলা যোগায়, উৎপাদনের যোগাড়যন্ত্র করে। বাকি অংশটা যোগায় মজুরী। সমাজের গোটা পুঁজির মধ্যে উৎপাদনের যোগাড়যন্ত্র বাবদ খরচ করার অংশটা মজুরী বাবদ খরচ করার অংশের চেয়ে যত বেড়ে যাবে, ততই বুঝতে হবে ধনতন্ত্র এগিয়ে যাচ্ছে এবং সমাজতন্ত্র ঘনিয়ে আসছে।

স্বখাত সলিলে

পুঁজির পাহাড় যত উঁচু হয়, ততই নতুন নতুন কল এসে মজুরের জায়গা জুড়ে বসে। একদিকে ধনদৌলত আকাশ ছোঁয়, অন্যদিকে দেখা দেয় অন্তহীন হাহাকার। বেকার মানুষের ভিড়ে পথঘাট ছেয়ে যায়। পুঁজির রাজত্বে তারা হয়ে যায় নেহাত অদরকারী ফাল্‌তু লোক। মালিকদের দুয়োরে দুয়োরে পেটের জ্বালায় যতই তারা হন্যে হয়ে বেড়ায়, ততই মজুরদেরও পেট কাটা যায়।

সাত দুয়োরে ধর্ণা দিচ্ছে
কাজ চাইছে বেকার।
মালিক বলে, রাস্তা দেখ—
এ জগতে কে কার ?

এমনিভাবে কাজ ছাড়িয়ে মজুরদের পথে বসিয়ে পুঁজি হু হু করে এগিয়ে চলে। ধারদেনার ষোলআনা সুযোগ-সুবিধেগুলো সে পুরোদস্তুর ভোগ করে। উৎপাদনের উপায়ে

লাগানো পুঁজির অংশ বিস্তর বেড়ে যায়। তৈরি মালে বাজার ছেয়ে যায়। সবটাই হয় তালকানার মত।

জিনিস তৈরি হয় লাভের তাড়নায়, অভাব মেটাবার তাগিদে নয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা লোকের কাজ ঘুচিয়ে হাত খালি ক'রে অভাব আরও বাড়িয়ে দেয়। এমনি করে মালিকরা নিজের পায়ে নিজেরাই কুড়ুল মারে। লোকের অভাব আছে, কিন্তু সেই অভাব মেটাবার উপায় নেই। বাজারে জিনিসের ছড়াছড়ি, কিন্তু কেনবার লোক নেই। গুদামে বস্তাবন্দী মাল পচে। কারখানায় তালা পড়ে। পুঁজির দল ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ে। সংকটের ধাক্কায় পুঁজিবাদী দেশগুলো টলমল টলমল করে ওঠে। বছর কয়েক যেতে না যেতেই পুঁজিবাদ বার বার বেসামাল হয়ে পড়ে তারপর একটা সময় আসে, পুঁজিবাদের পায়ের নীচে থেকে দু'ভাগের এক ভাগ মাটি সরে গেল। পুঁজিবাদ কিছুতেই আর নিজেকে সামাল দিতে পারে না। সমানে টলে পড়তে থাকে। চোরাবালিতে দাঁড়িয়ে যতই সে পা ছোঁড়ে, স্বখাত সলিলে ততই সে নিজের মৃত্যু নিজে ডেকে আনে।

মাৎস্য-ন্যায়

পুঁজির এই বাড়বৃদ্ধি আর সেকালে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমানোর মধ্যে তফাত ছিল। সেকালে ঠ্যাঙাড়ের দল সিন্ধুকে টাকা জমিয়েছিল চুরি-ডাকাতি-রাহাজানি করে, 'জোর যার মুলুক তার' নীতির জোরে—শিল্পীকারিগরদের হাত থেকে রুজিরোজগারের উপায়গুলো ছিনিয়ে নিয়ে।

চাষীদের জমি থেকে খেদিয়ে দিয়ে দলে দলে তাদের গাঁ-ছাড়া করা হয়েছিল। তারা কেউ গেল বনেজঙ্গলে, কেউ শহরে। যা ছিল গাঁসুদ্ধ সকলের, জন কয়েকে তার মালিক হয়ে বসল। পরের দেশ বাঁধা পড়ল গোলামির শেকলে। ঋণের বোঝা চাপিয়ে সরকারের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হল। পাছে বাইরে থেকে এসে কেউ ভাগ বসায়, তাই দেশের চারদিকে উঠল শুল্কের পাঁচিল। এমনি করে বড়লোকদের হাতে টাকা জমতে লাগল। তার ফলে, সমাজে দেখা দিল একদিকে গতরসর্বস্ব কপর্দকহীনের দল, অন্যদিকে একদল ব'সে-ব'সে-খাওয়া টাকার কুমির।

কড়ির সেই পাহাড়টার পরতে পরতে জমাট বেঁধে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের অনেক চোখের জল, অনেক রক্ত। যে চাষী রোদবৃষ্টি মাথায় নিয়ে নিজের হাতে মাঠে মাঠে ফসল ফলাত, যে কারিগর উদয়াস্ত হাতের কাজ করত—তার হাতে আর মালিকানা রইল না। যারা খেটে খায়, তাদের হাত থেকে মালিকানা চলে গেল যারা বসে খায় তাদের হাতে।

মুদ্রারাক্ষসের পালা

দখল-বেদখলের পালা এখানেই শেষ হল না। শুধু তার রকমফের হল। যারা নিজের হাতে কাজ করত, এতদিন তারাই শুধু দখল হারাচ্ছিল। যে মালিক মজুরদের ঘাড়ে বসে খায়, এবার তাদের ধনসম্পত্তিও বেহাত হ'তে লাগল। এ-মালিকের সম্পত্তি ও-মালিকের হাতে চলে গেল। একজন মালিক অন্য পাঁচজন মালিককে না মেরে পারে না।

মালিকের হাতে মালিকের সর্বনাশ হয়। চুনোপুঁটিদের গিলে খেয়ে জনকয়েক মালিক হয় পেটমোটা রাঘববোয়াল। অজস্র হাতের ছড়ানো পুঁজি ক্রমে ক্রমে মাত্র কয়েকটা হাতে এসে জমা হয়। পুঁজি এবার দেখা দেয় মুদ্রারাক্ষস হয়ে।

যতই কম কম হাতে বেশী বেশী পুঁজি এসে জড়ো হয়, ততই কলকারবার ফলাও হয়ে বেড়ে ওঠে। বিরাট বিরাট জায়গা জুড়ে কারখানাগুলো হাত-পা ছড়ায়। প্রকৃতির বিরুদ্ধে এমন এমন যন্ত্র হাতে নিয়ে মানুষ লড়ে যে, তার জন্যে হাজার হাজার লোকের দরকার হয়। জনে জনে এমনভাবে খুঁটিনাটি কাজের ভাগ-বাঁটোয়ারা করা হয় যাতে একসঙ্গে অনেক হাতে মিলিয়ে-মিশিয়ে কাজ হয়। যন্ত্রের কারিকুরির ফলে উৎপাদন হয় অঢেল। উৎপাদনের উপায়গুলোকে বুঝেসম্ঝে হিসেব করে কাজে লাগানো হয়। এর জন্যে দরকার হয় সমাজে পরস্পরের যোগাযোগে হাতে হাত মেলানো খাটুনির। উৎপাদনের কাজে সমাজের বেবাক লোককে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে হয়।

তুনিয়াজোড়া বাজার দিয়ে পুঁজিবাদ তুনিয়ার মানুষকে বেঁধে ফেলে। পুঁজির তুনিয়াজোড়া চেহারা ধরা পড়ে। যত দিন যায়, ততই ঝেঁটিয়ে পুঁজি এসে কয়েকটি মাত্র হাতে জমা হতে থাকে। পুঁজিবাদী উৎপাদনের ক্ষীরসরটুকু তারা একাই চেটেপুটে খায়। অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষের তুঃখযন্ত্রণা, লাঞ্ছনা-অত্যাচার, দৈন্যতুর্দশা, শোষণ আর দাসত্ব চূড়ান্ত হয়ে দেখা দেয়।

বন্ধন-মোচন

পুঁজির এই বজ্র আঁটুনিটাই সব নয়। সেই সঙ্গে পুঁজির পাহাড় টলিয়ে মাথা উঁচু করে সঙ্ঘবদ্ধ মজুর। দিন দিন তারা দলে ভারী হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদনই মানুষের হাতে তুলে দেয় নিজের মৃত্যুবাণ, তালে তাল দিয়ে বেড়ে ওঠে মজুর শ্রেণীর শৃঙ্খলা, ঐক্য আর সংগঠন। সারা দুনিয়ার মজুর কাঁধে কাঁধ মেলায়।

পুঁজির আওতায় যে উৎপাদনের শক্তি দিনে দিনে বেড়ে উঠেছে, পুঁজির সর্বগ্রাসী জটাজালে তার দম বন্ধ হয়ে আসে। উৎপাদনের উপায়গুলো এমনভাবে এক জায়গায় এসে জোট বাঁধে, খাটুনি এমনভাবে এক জায়গায় গায়ে গা দিয়ে দাঁড়ায় —পুঁজিবাদের শেকলে তখন চাড় না লেগে পারে না। লক্ষ লক্ষ বলিষ্ঠ হাতে পুঁজির শক্ত নাগপাশ খসে পড়ে। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয় পুঁজিবাদের বন্ধন। পুঁজিবাদীদের ব্যক্তিগত মালিকানা পঞ্চত্ব পায়। সম্পত্তিচোরদের বামাল বেহাত হয়।

ভূত তাড়ানোর মন্ত্র



ভোঁ-ওঁ-ওঁ···ভোঁ-ওঁ-ওঁ···

ভোর হয়েছে কি হয়নি, এমন সময় আকাশ মাথায় ক'রে কে যেন খোনা গলায় হেঁকে উঠল :

ভোঁ-ওঁ-ওঁ···ভোঁ-ওঁ-ওঁ···

সকাল হতে না হতেই রোজ পেটে রাবণের ক্ষিধে নিয়ে আকাশে গলা বাড়িয়ে পুঁজির ভূত ডেকে ওঠে। কাঁচা ঘুম থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে চৌপহর দিন সে মজুরদের ঘাড়গুলো মট্‌কে খায়। পুঁজির ভূত থেকে থেকে তিন সন্ধ্যে ডাকে।

ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্তিরে ভয়-কাতুরে মানুষকে একা পেয়ে কাঁধে ভর করবে বলে তেঁতুল গাছের ডালে কাঠির মত সরু সরু ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে থাকে যে ভূতটা, সেটা নেহাত মন-গড়া মিথ্যে ভূত। ভয়-তরাসে মনের কোণে তার বাসা। মন থেকে ঝেড়ে ফেললেই ব্যস্, সে আর নেই।

পুঁজির ভূতটা কিন্তু অমন হেঁজি-পেজি ভূত নয়। মন থেকে ঝেড়ে ফেললেও যায় না। সত্যিকারের সেই বেয়াড়া ভূতটা থাকে পুরো শহর-বাজার জাঁকিয়ে। সিং-দরোজায় লট্‌কানো থাকে তার নামখেতাব। তার নুন খেয়ে গুণ

গায় পণ্ডিত-পুরুতের দল। খড়ি দিয়ে আঁক-জোক কষে তারা ঢাকে কাঠি দিয়ে বলে: "হুজুরের অক্ষয় পরমায়ু।" রাজ্যের লোককে পাখি-পড়ানো করে তারা শেখায়: "হুজুর যা করেন মঙ্গলের জন্যে। হুজুরই হলেন দিন-দুনিয়ার মালিক।" এমনি করে চোখে ধুলো দিয়ে কলকাঠির জোরে পুঁজির ভূত তার রাজ্যপাট বাড়ায়। একটা দিক উজাড় ক'রে অন্যদিকে চাঁদির হাট বসায়।

অন্ধকারে আড়ালে আবডালে নয়, রীতিমত খোলাখুলি দিনের আলোয় হেঁকে-ডেকে লোক জুটিয়ে পুঁজির ভূত কলে-কৌশলে তাদের গতরগুলোকে শুষে খায়।

শান্তি-স্বস্ত্যয়ন

দুনিয়ার কাঁধ থেকে ভূতটাকে নামাবার জন্যে তাই ওঝার দরকার হয়।

গোড়ায় গোড়ায় চলে ভূত তাড়াবার নানা জল্পনা-কল্পনা। বে-আক্কিলে বে-হিসেবী পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাকেই যত নষ্টের গোড়া ঠাওরিয়ে অসাধারণ একদল মানুষ সাহসে ভর করে এগিয়ে এলেন। কুড়ের বাদশাদের হাত থেকে উৎপাদনের কল-কাঠিগুলো নিয়ে তাঁরা দিতে চাইলেন কাজের লোকদের হাতে। কল্পনায় নিখুঁত সুন্দর করে তাঁরা গড়লেন এমন এক সব-পেয়েছির-দেশ—যেখানে ডোকলাচণ্ডী পুঁজির দেহধারী ভূতটার দৌরাত্ম্য নেই, যেখানে দরকার বুঝে জিনিস তৈরি এবং বিলি হয়, যেখানে আছে মানুষের অফুরন্ত সুখ, চিরস্থায়ী শান্তি, অটুট স্বাস্থ্য আর সকলের সুবিচার। পৃথিবীর সামনে

তাঁরা মেলে ধরলেন ভবিষ্যতের এক জমকালো ছবি। মশগুল হয়ে তাঁরা দেখলেন সমাজতন্ত্রের এক অসামান্য অনিন্দ্য-সুন্দর স্বপ্ন।

কিন্তু তাঁদের স্বপ্নাদ্য দাওয়াইতে ফল হল না। যে সর্ষে দিয়ে তাঁরা ভূত তাড়াতে চেয়েছিলেন, সেই সর্ষের মধ্যেই থেকে গিয়েছিল পুঁজির ভূত। বড়লোকদের মন গলিয়ে তাদের টাকায় আপোসে স্বর্গরাজ্য গড়বার সেই অসম্ভব বাসনা অপূর্ণ থেকে গেল। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন ক'রে পুঁজির ভূতকে ছাড়ানো গেল না।

বোঝা গেল, পুঁজির ভূত তাড়ানো আনাড়ি ওঝার কর্ম নয়। পুঁজিবাদী উৎপাদনের ব্যবস্থাটা যখন পাকাপোক্ত হল, দলবদ্ধ মজুর যখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, যখন তৈরি হল সমাজতন্ত্রের জমি—একমাত্র তখনই তুখোড় ওস্তাদ ওঝা পাওয়া সম্ভব হল।

জয়ের অস্ত্র

যাঁর মন্তরের জোরে ছ'ভাগের এক ভাগ দুনিয়ার কাঁধ থেকে একদিন সত্যি সত্যি পুঁজির ভূত ছেড়ে গেল, প্রাতঃস্মরণীয় সেই শক্তিমান পুরুষের নাম কার্ল মার্ক্স। ১৮১৮ সালের ৫ই মে জার্মানিতে তাঁর জন্ম। বড় ঘরে জন্মালেও বড়লোকেরা তাঁকে কখনই দলে পায়নি। তিনি নাম লিখিয়েছিলেন সর্বহারা মজুরের দলে।

বেতাল বেহিসেবী সমাজটার বদলে মার্ক্সও চেয়েছিলেন এক পরিপাটি গোছালো সমাজ। কিন্তু তাই বলে তিনি কল্পনায়

স্বর্গরাজ্যের ছক আঁকতে বসেননি। এর আগে যে সমাজটা ছিল, তার তিনি হাঁড়ির খবর নিয়েছেন। কেমন করে তার জন্ম হল, কি করে তা বেড়ে উঠল, কিভাবে তার জায়গায় গড়ে উঠল আজকের সমাজ—মার্ক্স সমস্ত কিছুই আদ্যোপান্ত জেনেছেন। আজকের সমাজটাকে তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখেছেন। যার জোরে আজকের সমাজটার বদলে ভবিষ্যতের সমাজ গড়ে উঠবে—সেই শক্তিগুলোকে তিনি পরখ করে দেখেছেন।

মার্ক্স আপন মনে সমাজতন্ত্রের স্বপ্নের জাল বোনেন নি; সাক্ষাৎ পুঁজিবাদী সমাজটার মধ্যেই তিনি দেখেছেন তার অনন্ত সম্ভাবনার বীজ। মার্ক্স জানতেন, বিনা চেষ্টায় আপনাআপনি সেই নতুন সমাজ এসে যাবে না। বিষম টানা-হেঁচড়ার ভেতর দিয়ে জোর-জার ক'রে তাকে এ পৃথিবীতে সম্ভব ক'রে তুলতে হবে। তার জন্যে চাই এক নতুন শক্তিধর শ্রেণী। সর্বহারা মজুরই হল সেই নতুন বিপ্লবী শ্রেণী। মার্ক্স সারা জীবন ধরে এই মজুর শ্রেণীর হাতেই দুনিয়া জয়ের অস্ত্র যুগিয়ে গেছেন।

মার্ক্স ও এঙ্গেলস্

সে যুগের শাসক শ্রেণী তাই মার্ক্সকে দেশ থেকে দেশান্তরে তাড়া ক'রে ফিরেছে। নিজের দেশে তাঁর ঠাঁই হয়নি। অভাব-অনটন, লাঞ্ছনা-অত্যাচার তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ঘুরেছে।

প্রুশিয়ার এক অবস্থাপন্ন ইহুদি পরিবারে মার্ক্সের জন্ম। তাঁর

বাবা ছিলেন একজন গণ্যমান্য উকিল। ছেলেবেলায় বাড়ীতে বিপ্লবী আবহাওয়ার মধ্যে মার্ক্স বড় হননি। বড় হয়ে বাড়ীর বাইরে পা দিয়ে তিনি বিপ্লবী হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনো শেষ ক'রে যখন তিনি কাজ নেবেন ভাবছিলেন, সেই সময় এক স্বাধীনচেতা অধ্যাপকের ওপর সরকারী জুলুম দেখে তাঁর মন বেঁকে বসল। অধ্যাপক না হ'য়ে মার্ক্স হলেন লেখক। কাগজ বার করলেন তিনি। তাঁর কাগজে বিপ্লবের আগুন ছুটতে দেখে সরকার সেই কাগজ বন্ধ ক'রে দিল। মার্ক্স চ'লে গেলেন প্যারিসে। সেখানে গিয়ে আবার একটি নতুন কাগজ বার ক'রে মার্ক্স বিপ্লবের কথা প্রচার করতে লাগলেন।

প্যারিসে থাকার সময় ১৮৪৪ সালে ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্-এর সঙ্গে মার্ক্সের প্রথম আলাপ। এই আলাপ ক্রমে দুজনের নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হয়। পৃথিবীকে বদলাবার কাজে এঙ্গেলস্ হলেন মার্ক্সের দোসর। তাঁরা দুজনে সে সময় বিপ্লবীদের ছোট ছোট দলগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করতেন। মধ্যবিত্তদের দোটানায়-পড়া মনোভাবের ভুল ধরিয়ে দিয়ে এই সময় তাঁরা শ্রমিক শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ থেকে সাম্যবাদের তত্ত্ব ও কর্মকৌশল স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন।

কথায় ও কাজে

১৮৪৫ সালে 'বিপজ্জনক বিপ্লবী' ব'লে মার্ক্সকে প্যারিস থেকে তাড়ানো হ'ল। বেলজিয়ামের ব্রুসেলস্ শহরে গিয়ে তিনি ঠাঁই নিলেন। সেখানে এঙ্গেলসের সাহায্যে মার্ক্স গ'ড়ে

তুললেন গোপনে প্রচার চালাবার এক সঙ্ঘ—'কমিউনিস্ট লীগ।' এই সঙ্ঘের নির্দেশে তাঁরা তুজনে মিলে লিখলেন 'সাম্যবাদীর ফতোয়া'।

১৮৪৯ সালে আবার তাঁকে সরকারী হুকুমে বেলজিয়াম ছাড়তে হ'ল। প্যারিস হ'য়ে মার্ক্স জার্মানিতে ফিরলেন। দেশে ফিরতেই তাঁর নামে মামলা রুজু করা হ'ল। কিন্তু মামলা টিঁকল না দেখে সে দেশের সরকার তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত করল। মার্ক্স এবার লণ্ডন শহরে গিয়ে উঠলেন। জীবনের বাকি দিনগুলো তাঁর দেশছাড়া হয়ে লণ্ডনেই কাটে।

নির্বাসিত অবস্থায় মার্ক্সকে সপরিবারে চরম অর্থকষ্টে পড়তে হয়। এই সময় এঙ্গেলস্ যদি তাঁকে সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য না করতেন, তাহ'লে মার্ক্সের পক্ষে শুধু লেখা নয়, নিজেকে টিঁকিয়ে রাখাও অসম্ভব হ'ত। লণ্ডনে থাকার সময় মার্ক্স 'ক্যাপিটাল' বা 'পুঁজি' নামে তাঁর যুগান্তকারী বই লেখায় হাত দেন।

নানান দেশের শ্রমিক আন্দোলনকে তুনিয়াজোড়া একটি খাতে বইয়ে দেবার জন্যে ১৮৬৪ সালে লণ্ডনে যে প্রথম আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ গ'ড়ে ওঠে, মার্ক্সই ছিলেন তার প্রাণ। মার্ক্স শুধু তুনিয়াটাকে জেনে ব'সে থাকেননি, তাকে বদ্‌লাবার কাজেও সমানভাবে হাত লাগিয়েছিলেন।

একদিকে আন্তর্জাতিক সংগঠনের গুরুভার, অন্যদিকে কঠিন তত্ত্বগত কাজ—অতিরিক্ত খাটুনিতে মার্ক্সের শরীর ভেঙে পড়ল। ১৮৮৩ সালের ১৪ই মার্চ লণ্ডন শহরে মার্ক্স

চিরনিদ্রায় শয়ান হলেন। পৃথিবীতে দিগ্বিজয়ী রণধ্বনি হয়ে জেগে রইল তাঁর মন্ত্র : 'তুনিয়ার মজুর এক হও।' তাঁর সেই মন্ত্রবলে পুঁজিবাদের পা থেকে ছ'ভাগের এক ভাগ মাটি সরিয়ে দিয়ে রুশ দেশের শ্রমিক শ্রেণী নতুন পৃথিবীতে তাঁর জন্মের শতবার্ষিকী পালন করল। জন্মের শতবার্ষিকীতে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে মার্ক্স পেলেন শ্রেষ্ঠ উপহার—শৃঙ্খলমুক্ত বহুবাঞ্ছিত নতুন পৃথিবী।

ইতিহাসের অর্থ

মার্ক্স যে চোখে তুনিয়াকে দেখেছিলেন, তারই মধ্যে ছিল অন্ধকার-আলো-করা দৃষ্টিপ্রদীপ—পৃথিবীকে মুক্ত করার মন্ত্র। শ্রমিক শ্রেণীর চোখেই তিনি তুনিয়াকে দেখেছিলেন।

এতদিন চোখের সামনে পৃথিবীটা ছিল যেন এক অর্থহীন তুর্বোধ্য পুঁথি। মার্ক্সই প্রথম তার অর্থ উদ্ধার করলেন। দেখা গেল, পুঁথিটা উল্টো করে ধরা হয়েছে এতদিন। তাই তার অর্থ পাওয়া যায়নি। মার্ক্স যেই পুঁথিটাকে সোজা ক'রে ধরলেন, অমনি তার অর্থ পাওয়া গেল।

দেখা গেল : অর্থনীতির গাঁটছড়ায় তুনিয়া বাঁধা। অর্থনীতির কলকাঠিগুলো ঘুরলে ইতিহাসেরও মোড় ফেরে। ইতিহাস কারো হাতের পুতুল নয়—কারো একার খেয়ালে ইতিহাসের ভাঙা-গড়া হয় না। তুনিয়ায় কোন কিছুই অকারণে হঠাৎ ঘটে না। আগে পরের প্রত্যেকটি ঘটনার সঙ্গে প্রত্যেকটি ঘটনার যোগ থাকে।

নিয়মের সূত্র দিয়ে ইতিহাস ঘটনার মালা গাঁথে। ঘটনার

খেই-হারা ভিড়ের মধ্যে থেকে নিয়মের সূত্রটাকে খুঁজে বার করতে হয়।

শ্রেণীতে শ্রেণীতে সংঘর্ষ

দুনিয়ার কিছুই স্থির হয়ে থেমে নেই। সব কিছুই বদ্‌লে যাচ্ছে, সব কিছুই পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে চলেছে। এই বদল হয় কারো খাতিরে কিম্বা হুকুমে নয়—বদল হয় ভেতরকার দুরন্ত তাড়নায়। সমাজের সমস্ত কিছু বদলের গোড়ায় থাকে অর্থনীতির তাগিদ। বাঁচবার আয়োজনটার ওপরই নির্ভর করে মানুষের বেঁচে থাকার ধরন। বাঁচবার যোগাড় করতে গিয়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ গ'ড়ে ওঠে। এই পাতানো সম্পর্কের নামই সমাজ। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই সম্পর্ক দিয়েই সমাজের ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাগুলো বেঁধে দেওয়া হয়। সমাজটা যখন যেমন হয়, ভাল-মন্দ ন্যায়-অন্যায়ের ধারণাগুলোও তখন তেমন হয়। বাঁচবার ধরন বদ্‌লালে মানুষের ধারণাগুলোও বদ্‌লে যায়।

প্রকৃতির ওপর দখল বাড়িয়ে মানুষ যুগে যুগে বীরদর্পে এগিয়ে চলে। উৎপাদনের ঢং যখন বদ্‌লায়, উৎপাদনের সম্পর্কে টান লাগে—এক শ্রেণীর সঙ্গে অন্য শ্রেণীর ঠোকাঠুকি বাধে। যারা সমাজের মাথায় জাঁকিয়ে ব'সে আছে, তারা গদি আঁকড়ে থেকে নতুন উৎপাদনের সঙ্গে খাপ-খাওয়া শ্রেণীটাকে প্রাণপণে পিষে মারার চেষ্টা করে। তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকা ঘুণ-ধরা কায়েমী শ্রেণীর সঙ্গে নতুন বলবীর্যবান

শ্রেণীর সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে সমাজ বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যায়।

বিপ্লবের আগুনে

এমনি ক'রেই আসে সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদ, পুঁজিবাদ থেকে সাম্যবাদ। শ্রেণী-সংগ্রামের অবিরাম তাড়নায় সমাজ ধাপে ধাপে এগিয়ে যায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটার সারা গায়ে আজ মারীগুটির মত ফুটে উঠেছে ধ্বংসের লক্ষণ। সমস্ত ধনদৌলত গিয়ে একাকার হচ্ছে কয়েকটি মাত্র হাতে। রুইকাতলা পুঁজির দল চুনোপুঁটিদের গিলে খাচ্ছে। যন্ত্র এসে মজুরদের কাজ ছাড়িয়ে গ'ড়ে তুলছে এক বিরাট বেকার-অক্ষৌহিনী। মানুষ যাচ্ছে রসাতলে।

ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে বার বার হানা দিয়ে ফেরে সংকট। একসঙ্গে অসংখ্য হাতে মিলেমিশে কাজ হয়, কিন্তু তার ফল গিয়ে ওঠে ছুচার জনের হাতে। উৎপাদনের ধরনের সঙ্গে উৎপাদনের সম্পর্কটা একেবারেই খাপ খায় না। জোর ক'রে চাপানো জোড়াতালির সম্পর্কে চিড় ধরে। মালিকের সঙ্গে মজুরের পোষায় না। পদে পদে বাধে সংঘর্ষ। দলবদ্ধ মজুর বিপ্লবের আগুনে পুরনো সম্পর্কটা পুড়িয়ে দিয়ে গড়ে তোলে মানুষে মানুষে নতুন সম্পর্ক। মানুষের হাত থেকে মানুষের দেওয়া শেষ বন্ধনটুকু ঘুচে যায়।

* এ কা লে র ব ই : ২ *

এমিল জোলা-র

'অ ঙ্কু র'

('জা র্মি না ল')

ফরাসী দেশের খনিমজুরদের জীবন এবং সংগ্রাম নিয়ে বিগত শতাব্দীর এ-উপন্যাস বিশ্বসাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। মনে হয় যেন আমাদেরই দেশের একালের বঞ্চিত খনিমজুরদের জীবন আলেখ্য। জোলা-র সেই অমর কাহিনী ঝরঝরে ভাষায় বিবৃত করেছেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

* এ কা লে র ব ই : ৩ *

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের

'এক যে ছিল'

(এঙ্গেলস্-এর 'অরিজিন অব দি ফ্যামিলি')